দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

একটি মেয়ে
থুতু ছিটিয়ে দিল
মনে হলো যেন বিষ
— পৃঃ ১৩

যাদবপুরের ছাত্রদের
মগজধোলাইয়ের
পাণ্ডা শিক্ষকরাও
— পৃঃ ১৫

৭০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ১৬ জুলাই ২০১৮।। ৩১ আষাঢ় - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ছদ্মবেশী মাওবাদী

আম-জনতার ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইসব ছদ্মবেশী মাওবাদীরা। নানাভাবে পুষ্ট করছেন মাওবাদী কর্মকাণ্ডকে। এইসব মুখোশপরা মাওবাদীদের চিহ্নিত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করাই দেশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৩১ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৬ জুলাই - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলাচিঠি : দিদি বদলে বুদ্ধ হলেন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধিতে দরাজ কেন্দ্র সরকার ▯ হরিশ দামোদরন ▯ ৮

কারা চাইছেন মোদীকে সরাতে ▯ আর দাস ▯ ১০

একটি মেয়ে থুতু ছিটিয়ে দিল মনে হলো যেন বিষ ▯ বিবেক অগ্নিহোত্রী ▯ ১৩

যাদবপুরে ছাত্রদের মগজ ধোলাইয়ের পাণ্ডা শিক্ষকরাও ▯ অভিজিৎ চক্রবর্তী ▯ ১৫

বুদ্ধিজীবীদের বশ করে বিভাজন ঘটাতে তৎপর মাওবাদীরা ▯ রূপসনাতন রায়বর্মণ ▯ ১৭

তৃণমূল আমলে হরেক প্রকারের নকশাল ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৩

তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলির দুরবস্থা ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৫

ভ্রমণ : শান্তির খোঁজে মায়াপুর ইসকনে ▯ শুভ্রা মল্লিক ▯ ২৬

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার ▯ তারকব্রহ্ম দাস অধিকারী ▯ ৩১

ভক্তি সাধনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশক রজনীকান্ত সেন ▯ ৩২

দেবদেবী ও অবতারগণের প্রতীকী তাৎপর্য ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ৩৩

গল্প : মুকুটমণিপুরের রাত▯ বর্ণালী রায় ▯ ৩৫

প্রাচীন ভারতের আইনি ব্যবস্থা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ▯ অশোক কুমার চক্রবর্তী ▯ ৪৩

বর্ষাকালের কৃষিকাজ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ স্মরণে : ৪০ ▯

রঙ্গম : ৪১▯ অন্যরকম : ৪২ ▯ চিত্রকথা : ৪৯ ▯

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৩ জুলাই, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শরিয়া আদালত

প্রকাশিত হবে
২৩ জুলাই, '১৮

মুসলমানরা দাবি তুলেছেন দেশের সর্বত্র শরিয়া আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, দাবি করা বা খারিজ করা নিয়ে নয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি সমান্তরাল আইনি ব্যবস্থা প্রচলন করার ভয়ঙ্কর প্রবণতা নিয়ে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি চিরকাল মুসলমানদের এই দেশদ্রোহী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছে স্রেফ ভোটের জন্য। এখনও দিয়ে চলেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— শরিয়া আদালত। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

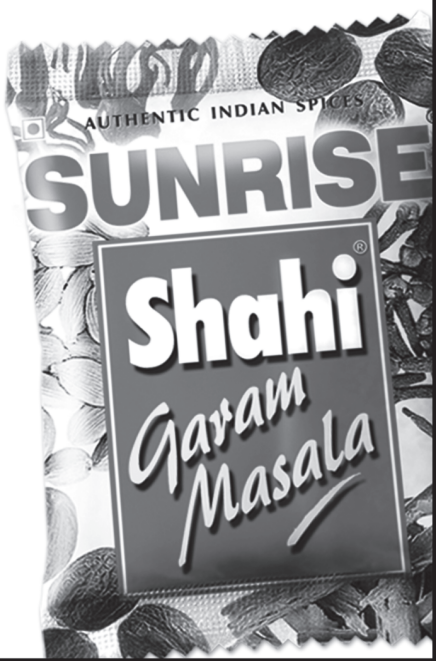

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অসমে নাগরিকপঞ্জি লইয়া বিভ্রান্তির চেষ্টা

জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নবায়নের চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের দিন (৩০ জুলাই '১৮) যতই আগাইয়া আসিতেছে ততই অসমে উত্তেজনা ও আতঙ্ক বাড়িতেছে। অসম অসমীয়দের—এই অদ্ভুত ধারণা লইয়া অসমের এক শ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। অসম হইতে বাঙালি হিন্দুদের বিতাড়ন না করিলে অসমে অসমীয়রা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে—এমনই এক কাল্পনিক আশঙ্কাকে তুলিয়া ধরিয়া তাহারা রাজ্যবাসীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকৌশল চালাইয়া যাইতেছেন। দুঃখের হইলেও সত্যি, রাজ্যের কিছু তথাকথিত বিচক্ষণ ব্যক্তিও ইহাদের মদত দিতেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণের সংশোধনী বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করেন তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। ওই সময় বিলটি সংসদে গৃহীতও হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে পনেরোটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে বিলটি লইয়া গড়িমসি সবাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কংগ্রেসের কিছু নেতা এখনও অপপ্রচার করিতেছেন, নাগরিকপঞ্জির খসড়া প্রকাশের পর অসমের অবস্থা মায়নমারের মতো হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, অসমের বর্তমান জোট সরকারের শরিক অগপ এখন উল্টো সুর গাহিতেছে।

এই প্রস্তাবিত নাগরিক আইন সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হইতেছে, সেই বিলের কোথাও 'বাঙালি হিন্দু' বা তাহাদের অসমে সংস্থাপনের উল্লেখ মাত্র নাই। প্রতিবেশী দেশ হইতে ধর্মীয় কারণে যাঁহারা নির্যাতিত হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরই আশ্রয়দানের লক্ষ্যে এই আইন। ইহা একটি কেন্দ্রীয় বিধি, সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব প্রদানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র আগরওয়াল। তাঁহার বক্তব্য, ধর্মের ভিত্তিতে যদি দেশ বিভাজন হইতে পারে তাহা হইলে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানে অসুবিধা কোথায়? এই প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে কোথাও আন্দোলন হয় নাই, ব্যতিক্রম একমাত্র অসম। যদিও সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার অযথা বিভ্রান্তি না ছড়াইবার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়াছেন। সঠিক নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ করা যে সরকারের দায়িত্ব তাহা তিনি আবারও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আসলে এক বহুমাত্রিক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে শুরু হইয়াছে। যাঁহারা অসমে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক পছন্দ করেন নাই, নানাভাবে তাঁহারা ইহার বিরোধিতা করিতেছেন। বিজেপি ক্ষমতা দখল করিলে সত্তর বৎসর ধরিয়া দেশভাগের বলি উদ্বাস্তু নাগরিকদের অমীমাংসিত বিষয়টির সুরাহা হইবে—এই প্রতিশ্রুতি তাহাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া হইয়াছিল। অগপ ইহা জানিয়াই বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধিয়াছিল। এখন এই প্রশ্নে মন্ত্রীসভা হইতে বাহির হইয়া আসিবার হুমকি রাজনৈতিক সুবিধা ব্যতীত আর কিছু নহে। এই আইনের বিরোধিতার আরও একটি কারণ, বিজেপিকে হিন্দুত্বের ধারক ও বাহক মনে করা হয়। আধুনিক পণ্ডিতরা যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, হিন্দুত্ব মানে ভারতীয়ত্ব। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ যে হিন্দুত্বের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। হিন্দুত্বই ভারতকে ঐক্য সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অসমে যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক তাহারা স্পষ্টতই তাই এই আইনের বিরোধী। অসমের ভাষা-সংস্কৃতি বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় নয়, নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতেই জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নের চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ লইয়া বিভ্রান্তি ছড়ানো হইতেছে।

সুভাষিতম্

উত্তমৈঃ সহ সঙ্গেন কো ন যাতি সমুন্নতিম্।
মুর্ধ্না তৃণাণি ধার্য্যন্তে গ্রথিতৈঃ কুসুমৈঃ সহ।। (চাণক্যনীতি)

সৎসঙ্গ করলে কোন ব্যক্তি না উন্নতি লাভ করতে পারে? গ্রথিত পুষ্পের সঙ্গে তৃণকেও লোকে মস্তকে ধারণ করে থাকে।

দিদি বদলে বুদ্ধ হলেন

মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা

কেমন লাগছে আপনার! শরীর অসুস্থ জানি, কিন্তু দিদির 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নিশ্চয়ই উপভোগ করছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত উত্থানের জন্ম হয়েছিল আপনার জমি অধিগ্রহণ নীতির প্রতিবাদ করে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেই তাই মমতা নীতি ঘোষণা করে বলেছিলেন—রাজ্য সরকার কোনও রকম জমি অধিগ্রহণ করবে না। 'না' শব্দটিতে আলাদা করে জোর দিয়েছিলেন মমতা। এখন তিনি চাইছেন জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করতে চাইছেন। সে কাজও শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও তো একই যুক্তি দিয়েছিলেন আপনি— 'জনস্বার্থ'।

হ্যাঁ বুদ্ধদেববাবু, আপনার সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইতে জিতেছিলেন তিনিই। সেই জয় মনে রয়েছে বাংলার। অনেক কাল মনে থাকবে। সাড়ে তিন দশকের বাম জমানার এন্তেকাল ছিল তাসের ঘর ভেঙে পড়ার মতো। বাম-বাহিনীর কেউকেটারাও জিততে পারেননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আপনিও নন। সেই জয়ের পরে, মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার দিনেই তুলেছিলেন এক মোক্ষম স্লোগান— 'বদলা নয়, বদল চাই।' আজ সেই স্লোগান অন্য মানে নিয়ে সামনে।

এখন সত্যিই বদল আসছে। সেদিন মমতা রাজ্যে 'বদলা' নেওয়ার গোলমাল ঠেকাতে 'বদল' নীতি নিয়েছিলেন। এবার তিনি সত্যি বদলাচ্ছেন। নীতি বদলাচ্ছে। যে নীতির চূড়ান্ত বিরোধিতার পথ ধরে কালীঘাট থেকে মহাকরণ গিয়েছিলেন মমতা সেই পথকেই বেছে নিচ্ছেন নতুন 'বদল' দিনে। মমতার রাজনৈতিক জীবনের সব থেকে বড় লড়াই ছিল— সরকারি জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা। আজ সেই পথেই মমতা!

জ্যোতি বসু জমানা শেষ হয়ে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই নতুন স্লোগান তুলেছিলেন— 'ডুইট নাউ'। সাদা ধুতি, সাদা পোশাকের বুদ্ধবাবুর ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছিল সেই স্লোগান। সাফল্য কতটা এসেছিল, তা নিয়ে এখানে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। প্রথমবার ক্ষমতায় এসেও প্রশাসনে গতি আনতে একই স্লোগান শুনিয়েছেন মমতা। কিন্তু তাতে মন্থর প্রশাসনে বদল আসেনি।

বাম জমানার যে যে অসুখের বদল আনার স্বপ্ন দেখেছিলেন মমতা, তার সবই ভেস্তে গিয়েছে। নির্মাণ শিল্পে সিন্ডিকেট রাজ, পথে-ঘাটে অটোচালকদের অটোক্রেসি, তোলাবাজি— কিছু থেকেই মুক্ত করা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। নেত্রী মুখে এক রকম বদল চেয়েছিলেন, কিন্তু কাজে এনেছেন অন্য রকম।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাম জমানায় 'অনিলায়ন' ছিল। এখন রয়েছে 'পার্থায়ন'। বাম ট্র্যাডিশন মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের জায়গায় শুধু ঠিকানা বদলেছে। উপাচার্যরা শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব তথা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পর্যবেক্ষক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছোটেন পরামর্শ নিতে। পরামর্শ নয়, নির্দেশ পেতে। যেখানে আপনার নির্দেশ পার্থ উবাচ হয়ে নির্গত হয়।

এসবের বিরুদ্ধে নিজের আমলে আপনিও সরব হয়েছিলেন 'মুখ্যমন্ত্রী' বুদ্ধদেব। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিট পাত্তা দেয়নি। এবারেও কলেজে ভর্তি কেলেঙ্কারির পরে কলেজ ক্যাম্পাসে ছুটতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। রাতারাতি টিএমসিপির রাজ্য সভাপতিকে অপসারণ করা, সবই করতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সরকারের খরচ কমাতে এক সময়ে বুদ্ধদেব আপনি বলেছিলেন, ''ফুলের খরচ কমাও। আমাকে আর ফুল দিও না কেউ।'' এখন সরকার চালাতে সেই পথে মমতাও বলছেন— আর ফুলের জলসা নয়। বিরিয়ানির। কাজের থেকে প্রচারে খরচ কত বেশি করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে নতুন সরকার। কন্যাশ্রীর টাকা এখনও পর্যন্ত যতজন পেয়েছে তার থেকে বেশি খরচ হয়েছে এই প্রকল্পের প্রচারে। প্রকল্প হাতে তুলে দেওয়ার মঞ্চ বানাতে গিয়ে। আমি নিশ্চিত যে, ওই খরচ কমালে আরও অনেক মেয়ে লেখাপড়া করতে পারত।

গত এপ্রিল মাসেই আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন মমতা। আপনাকে দেখতে। কী কী কথা হয়েছিল কে জানে! সবটাই তো গোপন। কিছু টিপস্ দিয়েছিলেন কি! ফের যদি দেখা হয় তবে আপনি পারলে মনে করিয়ে দেবেন আপনার শেষ সময়ের দিনগুলো। উনি একটু প্রস্তুত হতে পারবেন।

—**সুন্দর মৌলিক**

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধিতে দরাজ কেন্দ্র সরকার

অতিথি কলম

হরিশ দামোদরন

ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার কিছুটা পূর্বতন ইউপিএ সরকারের রীতিতেই কৃষকের উৎপাদিত শস্যের দামে ক্ষমতায় থাকার শেষ বছরে এসে বড়সড় বৃদ্ধি ঘটাল। বিশেষ করে ধান ও গমের ক্ষেত্রে সরকারি মধ্যস্থতায়ই শস্য দু'টি সংগৃহীত হয়। সরকারই গরিষ্ঠাংশ নিজে কিনে নেয়। ধানের ক্ষেত্রে মোদী নেতৃত্বের এনডিএ সরকার বিগত ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কিছুটা এককালীন বড় বৃদ্ধির ফর্মুলা অনুসরণ করেছে। সম্প্রতি ঘোষিত খরিফ শস্যের সহায়ক মূল্য অনুযায়ী সরকার সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে ৪৪০ টাকা প্রতি কুইন্টাল ও বিশেষ জাতের জন্য (গ্রুপ-এ) ৪২৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। এখানে গ্রেড-এ চিহ্নিত হয়নি। এই বৃদ্ধি প্রথম ইউপিএ সরকারের ৩৫০ টাকা ও দ্বিতীয় ইউপিএ-এর ৪১০-৪১৫ থেকে অনেকটাই বেশি।

একইভাবে গমের ক্ষেত্রেও মোদী সরকারের এ পর্যন্ত ৪ বছর শাসনকালে সহায়ক মূল্য ৩৩৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে যা দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের ৩২০ টাকার থেকে বেশি। অবশ্য প্রথম ইউপিএ আমলের ৪৫০ টাকা বৃদ্ধির তুলনায় এটি অবশ্যই কম। তবে সংসদীয় নির্বাচনের আগে রবিশস্য উৎপাদনের জন্য আরও একটি মরসুম হাতে থাকবে। কেননা নির্বাচন এখনকার হিসেবে এখনও ৯ মাস পরে নির্ধারিত। গম বোনার সময় নভেম্বর ডিসেম্বর এবং শস্য মাঠ থেকে তোলা হয় মার্চ-এপ্রিলে সেই সময়ের বৃদ্ধিটিকে ধরলে ইউপিএ-১ এর সামগ্রিক বৃদ্ধিকেও ঘোষিত বৃদ্ধির হার ছাড়িয়ে যাবে।

এখন দেখতে হবে ইউপিএ সরকারের চেয়ে বর্তমান মোদী সরকারের এম এস পি (ন্যূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি) জনিত বৃদ্ধির অনেকটাই আগে থেকে বেড়ে ওঠা। সরকারের ক্ষমতায় থাকা প্রথম তিন বছরের পুরো সময়টাই ধানের এমএসপি কুইন্টাল প্রতি বেড়েছিল গড়ে মাত্র ১৬০-১৬৫ টাকা। এই বৃদ্ধি এই বছরের জন্য ঘোষিত (২০১৮-১৯) ১৮০-২০০ টাকার থেকে কম। একই ভাবে গমের এম এস পি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে বাড়ানো হয়েছিল মাত্র ৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। ২০১৫-১৬ সালে বৃদ্ধি ছিল ৭৫ টাকা। আর ১৬-১৭, ১৭-১৮-এর পরবর্তী দুটি বছরে এই বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১০০ ও ১১০ টাকা। তাহলে চার বছরে মোট বৃদ্ধি ৫০+৭৫+১০০+১১০=৩৩৫ টাকা। সহজ হিসেবে সরকারের প্রথম তিন বছর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্বতন অটলবিহারী সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৃদ্ধিকে অনেকটাই আঁটো সাটো সীমার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছিল। এই সূত্রে এনডিএ সরকারের ৬ বছরের গোটা কার্যকালে ধানের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩৫ টাকা ও গমের ক্ষেত্রে ১২০ টাকা প্রতি কুইন্টাল বাড়ানো হয়েছিল। মোদী সরকার প্রথম দিকে এম এস পি বৃদ্ধির ওপর পুরোপুরি রাশ টেনে রেখেছিল যা সার্বিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের নীতির সঙ্গে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মর্মে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছিল। এখানেই থেমে না থেকে যে সমস্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্র নির্ধারিত এম এস পি ছাড়াও আরও কিছু বোনাস দিয়ে শস্য কিনছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকার তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এই সুবাদে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় যেখানে বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে— যেখানে কেন্দ্র জানিয়েছিল যদি রাজ্য সরকার ধান ও গমের নির্ধারিত মূল্যের ওপর কুইন্টাল প্রতি ১৩০ বা ২০০ টাকা শস্য অনুযায়ী বোনাস দেয় সেক্ষেত্রে কেন্দ্র তাদের রেশন দোকানে বিলি করার জন্য যতটুকু চাল গম দরকার তার বেশি এক দানাও কিনবে না। যে রাজ্য সরকার বাড়তি বোনাস দিয়ে অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ করে রাখবে সেই শস্য তাদের হাতে উদ্বৃত্তই থাকবে অথবা তাদের নিজেদেরই তা বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ চাল রপ্তানিকারক। মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব এগরিকালচার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সারা বিশ্বে চাল রপ্তানির আনুমানিক পরিমাণ ঘোষণা করেছে ৪৯ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ভারত ১৮ মিলিয়ন টন, থাইল্যান্ড ১১ মিলিয়ন টন, ভিয়েতনাম ৭ মিলিয়ন টন, পাকিস্তান ৪ মিলিয়ন টন, মায়নামার ও আমেরিকা ৩.৫ ও ৩.৩ মিলিয়ন টন।

কিন্তু নির্বাচন এখন দোরগোড়ায়। মুদ্রাস্ফীতি এখন অগ্রাধিকারের তালিকায় যতটা না থাকবে অবশ্যই চাষিকে খুশি করার দায় তার থেকে বেশি থাকবে। ছত্তিশগড় সরকার গত নভেম্বর মাসেই ধানের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল এম এস পি-র ওপর বোনাস ঘোষণা করেছে। এই বৃদ্ধি শুধু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শস্যের ওপর নয় বিগত বছরগুলিতে যে দাম দেওয়া হয়েছে এই বৃদ্ধি ধরে সেক্ষেত্রে বকেয়া দেওয়া হবে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ গমের ওপর ২০১৭-১৮ সালে একটি স্পেশাল ২৬৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। ২০১৬-১৭ বছরের জন্য এই বৃদ্ধি ২৬৫ টাকা না হলেও বাড়তি ২০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল বকেয়া হিসেবে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, এই দুটি রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচন নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এখন দেখার ২০১৮-১৯ সালের জন্যও ধান ও গমের এম এস পি-র ওপর তারা বাড়তি কতটা বোনাস ঘোষণা করে। এখন দেখতে হবে ধানের ও গমের ওপর চলতি যে এম এস পি বৃদ্ধি ঘটল তার প্রভাব বা বাজারে প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। এটা নিশ্চিত যে এর ফলে সরকারি নিগমগুলিই এই বর্ধিত মূল্যের শস্য বেশি পরিমাণে কিনবে। তুলনামূলক ভাবে বেসরকারি ব্যবসাদাররা নজর কম দেবে। শতাব্দীর শুরু থেকেই ধান ও গমের সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানতাই লক্ষ্য করা গেছে। সাম্প্রতিক রবি মরসুমে যে ৩৫.৫১ মিলিয়ন টন গম সরকার সংগ্রহ করেছে তা মোট আনুমানিক উৎপাদন ৯৮.৬১ মিলিয়ন টন (২০১৭-১৮০)-এর শতকরা ৩৬ শতাংশ। একইভাবে সারাদেশে ধান থেকে যত চাল মিল ভেঙেছে অর্থাৎ ১১১.৫২ মিলিয়ন টন তার ৩৬.১৮ মিলিয়ন টন সরকার ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছে। সেপ্টেম্বরে মরসুম শেষ হলে হিসেবটা আরও বাড়বে।

বেড়ে চলা এম এস পি-র সামগ্রিক অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা অনভিপ্রেত দিক আছে। ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া বাসমতী চালকে আন্তর্জাতিক বাজারে তা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে করে দিতে পারে। অন্য দেশ কম দামে সরবরাহ করার সুলুকসন্ধান করবে। ২০১৭-১৮ (এপ্রিল-মার্চ) সালে দেশ থেকে ১২.৬৮ মিলিয়ন টন চাল (এর মধ্যে ৪.০৫ মিলিয়ন টন বাসমতী ও ৮.৬৩ মিলিয়ন টন সাধারণ চাল আছে) রপ্তানি হয়েছে। এর অর্থমূল্য ৪৯ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা। ২২৯২৭ কোটি টাকার সাধারণ চাল ও ২৬ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার বাসমতী চাল।

বলা দরকার, থাইল্যান্ডের লম্বা দানার সাদা চালের মধ্যে ৫ শতাংশ চাল ভাঙা থাকে যার বর্তমান দর ৪০০ থেকে ৪২০ ডলার প্রতি টন। যদি এই দামকে (ডলার) টাকায় বদলানো যায় (৬৮ টাকা ডলার) তাহলে প্রতি কিলোতে দাম দঁড়ায় ২৭ থেকে ২৮ টাকা। এখন যদি ওড়িশা বা ছত্তিশগড়ের কোনও চালকল মালিক নতুন এম এস পি ১৭৫০ টাকা করে প্রতি কুইন্টাল ধান কেনে সেই ধান ভাঙিয়ে ২৫ শতাংশ নষ্ট বাদ দিয়ে অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ চালের প্রতি কিলো দাম দাঁড়ায় ২৬ টাকা প্রতি কেজি। এখন চালকলের সমস্ত খরচ যেমন— কর্মীর মাইনে, ইলেকট্রিক বিল এগুলোর খরচ চালের খুদ বা ভাঙা অংশ ও তুষ বিক্রি করে অনেকটাই উঠে যাবে যদি এমনটাও ধরে নেওয়া যায়। তবুও চাল বস্তাবন্দি করা থেকে স্থানীয় কর ও রপ্তানি বন্দরে নিয়ে যাওয়ার পরিবহণ খরচ (যেমন ওড়িশার কাকিনাড়া বন্দর) ধরলে প্রতি কিলোর অ-বাসমতি চালের দাম দাঁড়াবে ৩০ টাকা অর্থাৎ ডলার হিসেবে ৪৪০ টাকা প্রতি টন।

এই সূত্রে সারা ভারত চাল রপ্তানি সংস্থার সভাপতি বিজয় মেটিয়া জানাচ্ছেন যে, বর্ধিত এম এস পি বিশ্ববাজার মেনে নেবে। কেননা ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ চাল রপ্তানিকারক। বিশেষ করে বাসমতীর ওপর ভারতের প্রায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম রয়েছে যা সব সময়ই বাড়তি দর হাঁকতে পারে আর অ-বাসমতির ক্ষেত্রেও ভারত ক্রেতাকে বাড়তি দাম দিতে বাধ্য করতেই পারে।

মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব এগরিকালচার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সারা বিশ্বে চাল রপ্তানির আনুমানিক পরিমাণ ঘোষণা করেছে ৪৯ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ভারত ১৮ মিলিয়ন টন, থাইল্যান্ড ১১ মিলিয়ন টন, ভিয়েতনাম ৭ মিলিয়ন টন, পাকিস্তান ৪ মিলিয়ন টন, মায়নামার ও আমেরিকা ৩.৫ ও ৩.৩ মিলিয়ন টন।

রপ্তানিতে যদি লাভ তেমন না পাওয়া যায় বেসরকারি সংস্থারা ধান বা চাল কম কিনবে সেই বাড়তি শস্য তখন সরকারেরই অনুমোদিত গুদামে জমা হবে। সরকারকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। ■

রম্যরচনা

একটি আন্তর্জাতিক বিমানে জরুরি অবতরণের জন্য বিমান সেবিকা ঘোষণা করলেন— ''লাফিয়ে লাইফবোটে নামতে হবে।'' কিন্তু যাত্রীরা রাজি হলেন না। বিমান সেবিকা নিরুপায় হয়ে ক্যাপটেনের সাহায্য চাইলেন। ক্যাপটেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ। তিনি সেবিকাকে বললেন— ''তুমি আমেরিকানদের বল এটি একটি সাহসিকতার কাজ। ব্রিটিশদের বল এটি অত্যন্ত গৌরবের কাজ। জার্মানদের বল এটাই নিয়মসিদ্ধ কাজ। জাপানিদের বল এটা আদেশ— তারা করবেন।''

বিমান সেবিকা উত্তেজিত হয়ে বললেন— ''আরও কিছু যাত্রী আছেন ভারত ও সিঙ্গাপুর থেকে, তাদের কী হবে?''

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন— ''তোমাকে সিঙ্গাপুরিদের কিছু বলতে হবে না। তারা বাকিদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই এসে যাবেন।''

—আর ভারতীয়রা? বিমানসেবিকার প্রশ্ন।

ক্যাপ্টেন মৃদু হেসে বললেন— ''খুবই সহজ, যাও শুধু গিয়ে ওদের বল এই কাজটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।''

উবাচ

"ভারত ইসলামি গণতন্ত্র নয়। জেলা, শহর, গ্রাম যাই হোক না কেন, এখানে শারিয়া আদালতের কোনও স্থান নেই। আদালত চলবে আইন মেনেই।"

দেশে ইসলামি আদালত স্থাপন প্রসঙ্গে

মীনাক্ষি লেখি
বিজেপি সাংসদ

"রাজ্যসরকার সহযোগিতা না করলে পুজোর আগে সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রোরেল চালু হবে না।"

কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

"আমি আর বেশিদিন উপাচার্য থাকছি না। তোমরা শীঘ্রই নতুন উপাচার্য পাবে। আমি উপাচার্য হিসেবে ব্যর্থ।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা সামলাতে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি

সুরঞ্জন দাস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায

"বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি তাজমহল। বাইরের যে কোনও মসজিদে মুসলমানরা নমাজ পড়তে পারেন। তাজমহলের ভিতরেই কেন?"

তাজমহলের ভিতরে নমাজ পড়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে

এ কে সিক্রি ও অশোক ভূষণ
ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি

"ভারতে মোবাইল ফোন কারখানার সংখ্যা মাত্র চার বছরে ১২০-তে পৌঁছে গেছে। এর আগে মাত্র দুটি ছিল। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে।"

নয়ডায় বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল কারখানার উদ্বোধনের বক্তব্যে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কারা চাইছেন মোদীকে সরাতে

আর দাস

কারা চাইছে নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে দিতে? মোদীকে বা অমিত শাহকে সরাতে পারলে কারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে? কারা তারা? এটাই সবচেয়ে বেশি করে মনে আসছে! শুধুমাত্র কংগ্রেস নয়, এর পিছনে আছে, এক বিশাল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। মনে আছে মণিশঙ্কর আয়ার পাকিস্তানে গিয়ে কী বলে এসেছিলেন? 'মোদী হটাও আউর হামে লাও।' মনে পড়ছে, সাম্প্রতিককালের (৮ জুন, ২০১৮) দিল্লির আইনজ্ঞ জে এন ইউ-এর রোনা উইলসন, অরুন্ধতী রায়, মাওবাদের সমর্থক প্রোফেসর হরগোপাল, মহারাষ্ট্রের সাংবাদিক সুরেন্দ্র গাডলিং ও মাওবাদী কমরেড প্রকাশের চাঞ্চল্যকর অভিসন্ধির কথা প্রকাশ পেয়েছে দেশের প্রধান কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে। মনে পড়ছে, বিহারে ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময়, মোদীর জনসভায় পাটনাতে বোমা বিস্ফোরণের কথা? মনে আছে নিশ্চয়, বিহারের বেটি ইসরাত জাহানের (জুন, ২০১৩ সালে) আহমেদাবাদে মোদীকে মারার ষড়যন্ত্রের কথা নিশ্চয় ভুলে যাননি তো?

বিজেপি নেতা ড. সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর লেখা টুইট এবং ইন্টারভিউ থেকে অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা শুনলে সত্যিই মনে হয় হিন্দুর অস্তিত্ব বোধহয় আর মাত্র অল্প কিছুকাল আছে। ভুলে যান তোতা পাখির বুলি : হিন্দু সনাতন ধর্মের কোনও ক্ষয় হবে না। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আর বাংলাদেশ একদিন আমাদেরই ছিল। আজ আর তারা আমাদের নেই। পাকিস্তানে আজ ১ শতাংশ হিন্দু আর বাংলাদেশে মাত্র ৮ শতাংশ হিন্দু মরে বেঁচে আছে। কাশ্মীর, পশ্চিম বাংলা, অসম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ধীরে ধীরে হিন্দুহীন হতে চলেছে।

দিগ্বিজয় সিংহ, রণদীপ সুরজেওয়ালা আর মণিশঙ্কর আইয়ারের মোদীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, যে কোনও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনেই জাগিয়ে দেবে ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান নরেন্দ্র মোদীর হত্যার পরিকল্পনাটি কারা করছে! শুধু মোদী আর অমিত শাহই নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির আরও অনেক বিশিষ্ট নেতাকেই একসঙ্গে মেরে ফেলার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে। আর তা এই ভারতের বুকেই। আপনার কি মনে আছে, কীভাবে রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রাজীব দীক্ষিতকে (বাবা রামদেবের শিষ্য) হত্যা করা হয়েছিল? জানি আপনার মনে নেই, বেনজির ভুট্টো বা জন এফ কেনেডির হত্যার কথা! কিন্তু মনে রাখবেন, এই সমস্ত রাজনৈতিক হত্যার পিছনে ছিল কোনও ব্যক্তি বিশেষের অপসারণ শুধুমাত্র গদির জন্য। কিন্তু মোদীর মৃত্যু হলে হবে এক বিশেষ মতবাদের মৃত্যু, আর তা হিন্দুত্বের অকাল মৃত্যু। আজ সারা বিশ্বে চলছে তিনটি বিশেষ মতবাদের লড়াই। এক নম্বর হচ্ছে পশ্চিমি সভ্যতার অর্থাৎ খ্রিস্টীয় মতবাদ, দ্বিতীয় হচ্ছে ইসলামি জিহাদ আর তৃতীয় হচ্ছে কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই।

নায়কদের পরিচিতি : প্রথমেই বলা যায়, পাকিস্তানি কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কথা। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের এমন কোনও রাষ্ট্রনেতা ছিল না যাকে নিয়ে পাকিস্তানের মাথাব্যথা ছিল। কেননা নেহরুর ১৬ বছর রাজত্বকাল ছিল পাকিস্তানের পক্ষে সব থেকে স্বর্ণময় সময়। জাতীয়তাবাদী নেতা লালবাহাদুর শাস্ত্রী, যাঁর 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' স্লোগান পাকিস্তানের মর্মচ্ছেদ করেছিল। তাই তাসখন্দের সন্ধি প্রস্তাবের সময় অকালে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। মোদী পাকিস্তানকে শেষ করে দিয়েছেন, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে। পাকিস্তান আজ সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়েছে ইসলামি জিহাদের 'আঁতুড় ঘর' হিসাবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা আজ পাকিস্তান পরিচালিত বিশ্ব-ধ্বংসকারী ইসলামি জিহাদের শিকার হয়ে ভারতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু আর জাপানের দেশনায়ক সিঞ্জো আবে মোদীর সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছেন। ভারত মোদীর নেতৃত্বে আজ বিশ্বের মধ্যে এক বিশাল অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এহেন মোদীকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারলে 'গাজওয়া-ই-হিন্দের' পরিকল্পনা অচিরেই সিদ্ধ হবে। তাই পথের কাঁটা মোদীকে সরাতেই হবে কেননা 'হাস কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান' কিন্তু মোদী থাকতে তা হতে পারছে না। চার বার যুদ্ধে হেরেছে ছায়া যুদ্ধ জারি আছে কাশ্মীর ঘাঁটিতে।

চার্চ এবং বিদেশি মুদ্রায় পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহ।

নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন হিন্দুত্বের একনিষ্ঠ জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তথাকথিত আব্রাহামিক ধর্মমতের অর্থাৎ ইহুদি এবং খ্রিস্টান দুই ধর্মবিশ্বাসের বহু পূর্বেই সনাতন ধর্মের উৎপত্তি যার মূলভূত রূপ যদিও নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা, কিন্তু পৌত্তলিকতাও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে আবিষ্ট আছে। ভ্যাটিক্যানের পোপের ভাষায়, 'একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে এশিয়ায় হিদেনদের (পৌত্তলিকদের) মুক্তির শতাব্দী'। যেন তেন প্রকারেণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করতেই হবে। দক্ষিণ কোরিয়ায় (৯৮ শতাংশ খ্রিস্টান) এই কাজ মাত্র ৩ দশকেই সুচারু রূপে সিদ্ধ হয়েছে। ২০১৪ সালের পর মোদী সরকার, ভারতে ১৬ হাজারেরও বেশি মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। এতবড় শিল্প-উদ্যোগ (৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বন্ধ হওয়াতে পোপের ক্ষতি অর্থাৎ সোনিয়ার (যিনি ভারতে পোপের প্রতিনিধি)। লোকসানের জন্য মোদীকে তার মাশুল অবশ্যই দিতে হবে তাঁর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে। এটা অত্যন্ত সহজ সরল সূত্র। পাঠকের মনে আছে নিশ্চয় যে, ২০০৮ সালে ওড়িশায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দের জঘন্য হত্যার অন্যতম মূল নায়ক, রাধাকান্ত নায়ক, যিনি রাজ্যসভায় সোনিয়া গান্ধী বিশেষ মনোনীত কংগ্রেসের

প্রভাবশালী এমপি ছিলেন। ভারতে তিনি ছিলেন 'ওয়ার্ল্ড ভিসন' নামক মিশনারি সংস্থার প্রধান। সেই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, মুখ্য অভিযুক্ত রাধাকান্ত নায়ক-সহ ১২ জন পুরুষ ও মহিলা হিন্দু নামধারী ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ৮৩ বছর বয়সী স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী ও আরও ৭ জন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে জন্মাষ্টমীর গভীর রাত্রে অন্ধকারে নির্দয় ভাবে খুন করেছিল। কারণ কী ছিল? স্বামীজী ওড়িশার গরিব উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির ধর্মান্তরণ রোধ করেছিলেন শক্ত হাতে। তাই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল জীবনের বিনিময়ে। ঠিক তেমনি হয়েছিল কাঞ্চীকামকোটীর জগদ্‌গুরু স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতীকে নিয়ে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা (যিনি ছিলেন সোনিয়ার সেবিকা) ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বরে কালীপূজার রাত্রে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মিথ্যা করে সাজানো 'ভরদারাজ মন্দিরের' ম্যানেজারকে খুনের অভিযোগে।

আমরা অনেকেই জানি না সত্তরোর্ধ্ব ওই হিন্দু ধর্মাত্মার ঘরে রাখা হয়েছিল পর্নো ছবির একটা সিডি। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাকে দিয়ে এই জঘন্য কাজ করিয়েছিলেন শুধুমাত্র মুসলমান, খ্রিস্টান ও দলিত ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে। সে দিনটা ছিল দীপাবলি, হিন্দুদের এক মহান ও পবিত্র উৎসবের দিন। কোনও মুসলমান অথবা খ্রিস্টান ধর্মগুরুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারবে কোনও নেতা বা পুলিশ?

উত্তর পূর্ব ভারতের মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল এবং অসমে ৮০টি খ্রিস্টান উগ্রপন্থী সংগঠন সক্রিয়। তারা চার্চের সঙ্গে একজোট হয়ে সমান্তরাল সরকার চালায়। তারা অবৈধভাবে জুলুমবাজি করে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলে। প্রাণের ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এহেন উগ্রপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে মায়ানমারের ৮ কিলোমিটার ভিতরে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের' কৃতিত্ব কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্য যা গত ৭০ বছরের মধ্যে ভারতের অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী করে দেখাতে পারেননি

কট্টর মৌলবাদী মুসলমান উগ্রপন্থী।

১৯৪৭ সালে ভারত ভূখণ্ড বিভাজিত হয় মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। আর তার ফলে সৃষ্টি হয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর বাংলাদেশ নামের দুটি ইসলামিক রাষ্ট্র। আজ

মোদীকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারলে 'গাজওয়া-ই-হিন্দের' পরিকল্পনা অচিরেই সিদ্ধ হবে। তাই পথের কাঁটা মোদীকে সরাতেই হবে কেননা 'হাস কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান' কিন্তু মোদী থাকতে তা হতে পারছে না।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা চাইছে গোটা ভারতকেই মুসলমান দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

আর মুসলমান সংখ্যালঘুর ভোটের আশায় সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিগুলিই মুসলমান তোষণে ব্যস্ত আছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট, সিমি, পি ডি এফ ইত্যাদি অসংখ্য মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থী সংগঠন নিরন্তর কাজ করে চলেছে একই উদ্দেশ্য নিয়ে— তা হচ্ছে 'গাজওয়া-ই-হিন্দ', যা আজ থেকে ১০০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল বিন কাশিমের (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) আক্রমণ দিয়ে। কিন্তু ভারতমাতার অসংখ্য বীরসন্তানের অভূতপূর্ব বলিদানের জন্য এখনও পর্যন্ত তা অপূর্ণই রয়েছে। আধুনিক ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, ১০০০ বছর পরে জন্মানো নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী বেঁচে থাকতে সহজে সেটা হবেও না। তাই মোদীকে যেন তেন প্রকারেণ শেষ করে দিতেই হবে। তাহলেই ইসলামিক ইতিহাসের ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হতে পারবে।

ভ্রষ্টাচারী লোভী স্বার্থপর রাজনেতারা।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় ভারতকে বারবার বিদেশি আক্রমণকারীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আর ১০০০ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে, সেই সমস্ত লড়াইয়ে শয়তান শক্, বর্বর হূণ, পাঠান, মোগল, ফরাসি, ডাচ ও ব্রিটিশ শত্রুরা অন্যায় যুদ্ধে ভারতীয় রাজাদের হারিয়েছে। সম্মুখ সমরে তারা এঁটে উঠতে না পেরে দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য নিয়ে সত্যিকারে ভারতীয় বীর যোদ্ধাদের পরাজিত করতে পেরেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজের কথা এবং সিরাজ-মিরজাফর ক্লাইভের পলাশির যুদ্ধের কথা কারও অজানা নয়! আজকে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় স্বার্থান্বেষী লোভী হিন্দুনামধারী সেকুলারবাদী আর মার্কসবাদীদের বিজাতীয় দ্বিচারিতা। রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য অশ্রু বর্ষণ আর কাশ্মীর থেকে অত্যাচারিত হিন্দু পণ্ডিত বা পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত দলিত হিন্দুর জন্য রাজনেতাদের নীরবতা। মায়া, মমতা,

মুলায়মের মতো ধান্দাবাজ রাজনেতা যারা সোনিয়ার ছায়াসঙ্গী তারাই নরেন্দ্র মোদীর মৃত্যু কামনা করছে। আজ তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে পথের কাঁটাকে সরানোর জন্য। ভুটানের ডোক্‌লামে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে চীনা সৈন্যের লড়াই হচ্ছে তখন রাহুল গান্ধী দিল্লিস্থিত চীনা দূতাবাসে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করছেন। উদ্দেশ্যটা কী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কাশ্মীর সীমান্তে যখন ভারতীয় সৈনিকরা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করছে, সে সময় কংগ্রেস নেতা-সহ বিপক্ষীয় নেতারা ভারতীয় সৈন্যের সমালোচনা করে তাদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন। মোদী একা লড়াই করে চলেছেন একসঙ্গে ১৭ জন বিপক্ষীয় নেতার সঙ্গে। লালুর মতো দাগি আসামি, চন্দ্রবাবু আর সিদ্দারামাইয়ার মতো কট্টর হিন্দু বিদ্বেষী রাজনেতারা যারা নিজের দেশ তো দূরের কথা, নিজের মা-বোনকে বিদেশির হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে যাবে শুধু মাত্র গদির লোভে! আর এই সব নেতারাই আজ সর্বত্যাগী ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান নরেন্দ্র মোদীর মৃত্যু কামনা করছে।

কালোবাজারি, মুনাফাখোর আর বেনামী সম্পত্তির মালিকরা

দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ভারতকে এক দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করার পিছনে কার হাত আছে? পি. চিদাম্বরম ও তার সুযোগ্য পুত্র কার্তি চিদাম্বরম, মেহুল চোস্কি, বিজয় মাল্য, নীরব আর ললিত মোদী। লালু আর মুলায়ম যাদবদের সৃষ্টি করেছে কারা? একবার ভেবে দেখুন, লন্ডনের রেস্তোরাঁর সামান্য পরিচারিকা থেকে আজ সোনিয়া গান্ধী কীভাবে সারা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠলেন? যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে সুইস ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছেন, তাই তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চাইছে কুচক্রীর দল।

সঙ্গে রয়েছে কিছু সংবাদ মাধ্যম।

সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলগুলির মালিক হচ্ছে বিদেশি চার্চ নয়তো ইসলামিক দেশের শিল্পপতিরা। আজ রাজদীপ সারদেশাই, বরখা দত্ত, নিধি রাজদান, প্রণয় জেমস রায়, করণ থাপার-নামক টিভি সঞ্চালক আর তথাকথিত সাংবাদিকদের বহুল প্রচারিত আর প্রসারিত সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে হিন্দু বিরোধী এবং দেশ বিরোধী প্রচার ঘণ্টা ধরে অবিরাম চলছে ভারতের মাটিতেই। এদের দেশ বিরোধী কাজে বাধা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। এরা কি মোদীকে ছেড়ে দেবে? এরা সবাই সোনিয়ার ছায়াসঙ্গী।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা

দেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলো (যেমন জে এন ইউ, দিল্লি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) হচ্ছে উগ্রপন্থীদের আস্তানা। সেখানে শোভা সেন, প্রফেসর হরগোপাল ইত্যাদিরা ছাত্রদের ভারত বিভাজনের পাঠ পড়ান। 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে', 'ঘর ঘর সে আফজল নিকলেঙ্গে' ইত্যাদির সেমিনার আর সভা হয়। আর তাতে পৌরোহিত্য করেন রাহুল গান্ধী সিতারাম ইয়েচুরি আর অরবিন্দ কেজিরওয়ালের মতো দেশদ্রোহীরা। নরেন্দ্রভাই মোদী এই সব দেশবিরোধী কাজের বিরোধিতা করেছেন তাই এই ষড়যন্ত্র।

বিচারব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র এবং বাবুরা

দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সম্প্রদায় হচ্ছে কোর্টের কতিপয় জজসাহেব আর উকিলরা। রাম জেঠমালানী, অভিষেক মনু সিংভী আর কপিল সিব্বালেরা একবার কোর্টে শুনানির জন্য কত ফি নেন? ৮-১৫ লাখ টাকা। এরাই অযোধ্যার রামমন্দির হতে দেননি সেই ১৯৪৭ সাল থেকে। এরাই কার্তি চিদাম্বরম আর সলমান খাঁকে বাঁচিয়েছে জেলখাটা থেকে। জাস্তি চেলমেশ্বর, কে.টি. যোসেফ, তরুণ গোগই নামক সুপ্রিম কোর্টের জেদি জজেদের ছেলেমানুষি, আমরা কেন, বিশ্বের সবাই দেখেছে এই ইউ টিউবের যুগে। নরেন্দ্র মোদী এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চান। তাই নরেন্দ্র মোদীকে এরা সরিয়ে দিতে চায়।

২০১৯ সালে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি হেরে যায় তবে, জেনে রাখুন, আপনার আমার দিন শেষ। লিখে রাখুন আপনাদের ডায়েরিতে। বুঝতেই পারছেন না যে দেশের প্রতিটি জেলায় এবং প্রতিটি রাজ্যে ছোট ছোট অসংখ্য 'মিনি পাকিস্তান' গড়ে উঠেছে। শোনেননি নাকি, মমতার ডান হাত ফিরহাদ হাকিম কলকাতায় বিদেশি সাংবাদিকদের কী বলেছিলেন। প্রতিটি খ্রিস্টান এবং মুসলমান হচ্ছে হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধের শত্রু। তারা তো একদিন হিন্দুই ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে শুধু মাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। তাই তারা আজ এত হিন্দু বিদ্বেষী। এখনই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে বিজয়ী ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের নির্মম ভাবে হত্যা করেছে তৃণমূলী জহ্লাদরা। ভাবুন একবার ১৯৪৬ সালের সোহরাবর্দির ডাকা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' এর কথা। যদি বিজেপি পরাজিত হয় ঠিক সেরকমই হবে ২০১৯ সালের নির্বাচনের পর। তবে তা হবে আরও ভয়ানক ভাবে।

যদি বিজেপি পরাজিত হয়, সোনিয়া গান্ধী আবার ফিরে আসবেন এবং ভারতের মসনদে বসে ভ্যাটিক্যানের নির্দেশ মতো অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতকে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করে দেবেন। মুসলমান মৌলবি, খ্রিস্টান, পাদ্রি, কালোবাজারি আর ভ্রষ্টাচারী রাজনেতারা রোজ রাত্রে গোমাংসের পার্টি দেবে। মুঘল বা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ আবার ফিরে আসবে। চিরদিনের মতো ভারত আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। এবার আর কোনও স্পার্টাকাসের জন্মই হতে দেবে না। রোমিলা থাপারের 'এরিয়ান ইনভেশন' থিয়োরি প্রমাণ-সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হবে। রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীরা ভারতে 'সেকুলারবাদ' ফিরিয়ে আনবেন এবং মোদীর ভারতপ্রেম ভুলিয়ে দেবেন। উপনিষদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-কে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পশ্চিমবাংলা বলে আর কিছু থাকবে না। বাংলা, বিহার আর অসমের বিলয় ঘটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহৎ ইসলামিক বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে। মানুষের সবচেয়ে ভয় মৃত্যুকে। তাই ভেবে দেখবেন, ২০১৯-এ মোদী বিরোধীদের ক্ষমতায় আসতে দেওয়া উচিত হবে কিনা।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং চিকিৎসক)

একটি মেয়ে থুতু ছিটিয়ে দিল মনে হলো যেন বিষ

> ‘বামপন্থী দলগুলি কোনওরকম সেন্সর ছাড়াই সারাবছর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্লোগানের তুবড়ি ছোটায়। ক্যাম্পাসের দেওয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যায়। অথচ ‘থিঙ্ক ইন্ডিয়া’র মতো একটি অরাজনৈতিক সংগঠনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেন্সর বোর্ড অনুমোদিত ছবির প্রদর্শনী একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেওয়া হয়।’

বিবেক অগ্নিহোত্রী

সারারাত ট্রেন জার্নি করে পুনে থেকে কলকাতায় পৌঁছলাম। নৈঋতা অসুস্থ। ভোর পাঁচটায় হোটেলে পা রেখেই কল দিলাম একজন চিকিৎসককে। ভালোভাবে পরীক্ষা করে তিনি জানালেন নৈঋতার চিকেন পক্স হয়েছে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এই ধর্মযুদ্ধের শুরু থেকে নৈঋতা আমার সহযোদ্ধা। তাছাড়া, কলকাতা তার নিজের শহর। আমি যখন ওকে বাবা-মা’র কাছে পাঠানোর কথা ভাবছি ঠিক সেই সময় প্রীতম দত্তগুপ্ত নৈঋতাকে মেল করল। প্রীতম একটি ছাত্র সংগঠনের প্রধান। ওদেরই আমন্ত্রণে আমরা কলকাতায় এসেছি। কিন্তু কোনও কোনও সকাল এক সঙ্গে অনেক খারাপ খবর বয়ে নিয়ে আসে। এটা ছিল সেরকমই একটা দিন।

দেখলাম প্রীতম লিখেছে, ‘আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একেবারে শেষ মুহূর্তে ড. ত্রিগুণা সেন প্রেক্ষাগৃহে ছবির (বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম) প্রদর্শনী বাতিল করে দিয়েছে। ওদের যুক্তি, ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচন কমিশনের বিধিবদ্ধ আচরণবিধির পরিপন্থী। কোনও সন্দেহ নেই এই সিদ্ধান্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত বাকস্বাধীনতা বড়োসড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হলো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুখ্যাত সুশীল সমাজ এ ব্যাপারে শুধু নীরবতাই অবলম্বন করেননি, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে প্রকারান্তরে সমর্থনও করেছেন। একথা ঠিক আমরা কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিনি। বামপন্থী দলগুলি কোনওরকম সেন্সর ছাড়াই সারাবছর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্লোগানের তুবড়ি ছোটায়। ক্যাম্পাসের দেওয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যায়। অথচ ‘থিঙ্ক ইন্ডিয়া’র মতো একটি অরাজনৈতিক সংগঠনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেন্সর বোর্ড অনুমোদিত ছবির প্রদর্শনী একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেওয়া হয়।’

—প্রীতম দত্তগুপ্ত।

ইমেলে খবরটা জানিয়ে প্রীতম ফোন করল। ওর মুখে শুনলাম কীভাবে ওদের হয়রান করা হয়েছে। দিনের পর দিন ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তরে বসে থাকত। ইচ্ছে করে নানা টেবিলে ওদের ঘুরিয়ে বলা হতো, যাদবপুরের বেশিরভাগ ছাত্রই নাকি নকশালবিরোধী সিনেমা দেখতে পছন্দ করে না। এই নিয়ে বহুবার তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমার ছবির আয়োজক ছাত্ররা প্রশ্ন তুলেছে, ভারতের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী দেশবিরোধী স্লোগান মিছিল পছন্দ করে না, সেসব তাহলে যাদবপুরে হয় কেন? তর্কে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে কর্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সেন্সর কমিটি যদি সম্মতি দেয় তাহলে ছবিটি দেখানো যেতে পারে। বুঝুন একবার! সিবিএফসি ছাড়পত্র দেবার পরেও ওরা ছবিটি সেন্সর করতে চান। ‘থিঙ্ক ইন্ডিয়া’র ছাত্র প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে জানিয়ে দেয় যে, অভ্যন্তরীণ সেন্সর কমিটি কী সিদ্ধান্ত নেবেন তা যখন জানাই আছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত সরাসরি ছবি প্রদর্শনীর আবেদনপত্র বাতিল করা। যাই হোক, কোনওভাবেই বরফ গলানো গেল না। শেষপর্যন্ত ঠিক হলো, ড. ত্রিগুণা যেন অডিটোরিয়ামে ছবিটি দেখানো হবে। এই অডিটোরিয়াম অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত। নগদনারায়ণের বিনিময়ে ভাড়া নেওয়া যায়। কিন্তু তাও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল।

বিকেল চারটে পনেরো নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা দিলাম। প্রীতম জানিয়েছে, আমার পরিচালিত বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম ছবিটি ক্যাম্পাসের খোলা চত্বরে দেখানোর জন্য ওরা চেষ্টা করেছে। আমার ড্রাইভারের নাম প্রভু। সে বিহারের লোক। মনে হচ্ছে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব। তখনও আমার মনে আশা, প্রীতমরা নিশ্চয়ই ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আট নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করা মাত্র আমার সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। আমাদের গাড়ি দেখে কিছু একটা অনুমান করে দৌড়ে এল হিংস্র চেহারার একদল ছেলে-মেয়ে। হাতে প্ল্যাকার্ড, ঠোঁটে সিগারেট, মুখে স্লোগান। ওরা উন্মত্তের মতো গাড়িতে লাথি মারছিল। কিছুক্ষণ পর কাঁচ ভাঙার বিকট শব্দ পেয়ে দেখলাম প্রভুর গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন চুরমার হয়ে গেল।

প্রভু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার একমাত্র রুটিরুজি গাড়িটা বাঁচাবে নাকি আমায়, ঠিক বুঝতে পারছিল না। আমিও বুঝাত পারছিলাম না, কী করা উচিত। ওরা অকথ্য গালিগালাজ করছিল। তারই মধ্যে কেউ একজন বলল, 'অগ্নিহোত্রী, ইউ ব্লাডি, ফ্যাসিস্ট ব্রাহ্মিন...গো ব্যাক।' পরক্ষণেই একটি মেয়ে থুতু ছিটিয়ে দিল আমার গায়ে। মনে হলো থুতু নয় বোধহয় একদলা বিষ উড়ে এল আমার দিকে। আতঙ্কিত প্রভু আমাকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি জানলার কাঁচ তুলে দিল। ও খেয়াল করেনি তখন আমার ডানহাত জানলার বাইরে। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন আমার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিতেই ডান কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা টের পেলাম।

উন্মত্ত ছাত্রবাহিনীর নৃশংস আক্রমণ উপেক্ষা করে প্রভু আমায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে নিয়ে গেল। সেখানে অপেক্ষা করছিল অজস্র ছেলে-মেয়ে। ওরা আমার ছবি দেখতে চায়। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে রাগে গরগর করছে ওরা—যারা আমাকে খুন করতে চায়। শুনলাম, ছবি দেখানোর জন্য আনা পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছাত্র সংগঠকদের পক্ষ থেকে একজন বলল, ওরা মরিপিটের আশঙ্কা করছে। আমি যদি ওই বিরোধী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি তা হলে ভালো হয়।

আতান্তরে পড়লাম। আমি চিরকাল প্রেক্ষাগৃহের নিরাপদ ঘেরাটোপের মধ্যে ভাষণ দিয়েছি। আমার শ্রোতারা সকলে শিক্ষিত এবং মননশীল। যারা আমার ধ্বংস দেখার জন্য উন্মুখ তাদের সামনে আদৌ কি কিছু বলতে পারব? ওরা তখনও 'ব্রাহ্মণবাদ সে আজাদি, মনুবাদ সে আজাদি' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। মন শক্ত করে প্রস্তুত হলাম।

'ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি আপনাদের আজাদির কথা মেনে নিলাম। কিন্তু আপনারা বলুন, এই আজাদি কীভাবে আসবে? আপনারা মনে করছেন আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি। এটা আপনাদের সব থেকে বড়ো ভুল। আপনারাও ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন, আমিও বাসি। আপনারাও ভারতকে বদলাতে চান, আমিও চাই। আপনারা চান ভারতের নাম আরও উজ্জ্বল হোক যাতে সারা বিশ্ব বলে, ভারতমাতা কী জয়, বিশ্বাস করুন, আমিও তাই চাই। আমাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটাই। আপনাদের হাতে কালো পতাকা। আবার এখানকারই অন্য ছাত্রদের হাতে সাদা পতাকা। সাদা আর কালোর মধ্যে পার্থক্য হলো, কালো রং মৃত্যুর প্রতীক আর সাদা শান্তির। আপনারা ভারতের যে উন্নতি চান তার রং কালো। আমরা চাই উন্নতির রং হোক সাদা।'

মনে হলো স্লোগানের ঝাঁজ কিছুটা কমেছে। সংগঠকদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলে উঠল, 'বন্দে মাতরম্।' আমি আবার শুরু করলাম, 'এই লড়াই বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে নয়। এমনকী এ লড়াই বন্দে মাতরম্ এবং লাল সেলামের মধ্যেও নয়। এই লড়াই যাঁরা ভারতকে ভেতরে-বাহিরে মজবুত করতে চান আর যাঁরা ভঙ্গুর করে তুলতে চান, তাঁদের মধ্যে। বন্ধুগণ, আপনারা আজাদি দাবি করছেন। একজন ক্রীতদাসই আজাদি চাইতে পারে, আপনারা তো ক্রীতদাস নন। আজাদি চাইবার আগে একবার বাবা-মা'র কথা ভাবুন--- যাঁরা রক্তঘাম এক করে আপনাদের এখানে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছেন। লড়তে হলে তাদের বিরুদ্ধে লড়ুন যারা অসৎ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। তা না করে আপনারা যদি নিজের ভাইয়েরই মগজধোলাই করে তার মন ঘৃণায় ভরে দেন তাহলে জানবেন দেশ কোনওদিনই বদলাবে না।

'বন্ধুরা, যারা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করে বা ভারতকে ধ্বংস করার জন্য গলা ফাটায়, তাদের পাশে আমি কোনওদিনই থাকব না। আজকাল তো আবার নতুন একটা ফ্যাশন চালু হয়েছে। যে যত দেশের নিন্দে করবে সে তত বেশি খবরের শিরোনামে উঠে আসবে। ওটা অন্যায়। বরখা দত্ত, রাজদীপ সরদেশাইরা তাদের চ্যানেলে যাদের ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচয় দেয়, মনে রাখবেন তারা মোটেই ইনটেলেকচুয়াল নন। আপনাদের জানতে ইচ্ছে করে না, যারা সারাক্ষণ দেশের যাবতীয় পরম্পরা, ঐতিহ্য এবং উৎসবের নিন্দে করে কেন কেবলমাত্র তাদেরই ওরা ওদের চ্যানেলে আমন্ত্রণ জানায়! অথচ ভারতের যেসব বিজ্ঞানী মঙ্গলযানের নকশা তৈরি করেন তাঁরা উপেক্ষিত থেকে যান।'

আরও অনেক কথা বলে গেলাম। ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি সংগঠক ছাত্ররা পর্দার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর তীব্র স্লোগানবাজির মধ্যে ছবি শুরু হলো। মনে হচ্ছিল আমি একটা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। যাদবপুরে সম্ভবত পড়াশোনা বাদ দিয়ে সবকিছুই হয়। কিন্তু যা বেশি হয় তাকে কি রাজনীতি বলব? নাকি গুণ্ডামি? উত্তর আমার জানা নেই।

যাই হোক, ছবি এক সময় শেষ হলো। ভারতের যেসব জায়গায় এই ছবি দেখানো হয়েছে, সর্বত্র আমার সঙ্গে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। যাদবপুরে ছিল না। কারণ যাদবপুরের ছাত্ররা প্রশ্ন তুলতেই অভ্যস্ত, তার জবাব শুনতে নয়।

ফেরার সময় প্রভু জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন?'

'কারণ আমি কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার বাড়িয়ে জীবনে উন্নতি করার কথা বলি।'

'এতে ভুলটা কোথায়?' বলে প্রভু থামল। তারপর আবার বলল, 'ওরা কীসের জন্য লড়াই করছে?'

'গরিবদের জন্য।'

'আমিও তো গরিব। তা হলে ওরা আমার গাড়ি ভাঙল কেন?'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'আমিও এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি ভাই। এসো একটা খেলা খেলি। আমাদের মধ্যে যে প্রথম উত্তর খুঁজে পাবে সে অন্যজনকে জানাবে। কী, রাজি তো?'

(লেখকের আরবান নকশাল গ্রন্থ থেকে অনূদিত)

যাদবপুরে ছাত্রদের মগজধোলাইয়ের পাণ্ডা শিক্ষকরাও

এক সময় পশ্চিমবাংলা ছিল ছাত্রসংস্কৃতির পীঠস্থান। অতিবাম রাজনীতির করালগ্রাসে এবং বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক মেরুকরণের তাগিদে সেই ছাত্র সংস্কৃতি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও এর শিকার।

অভিজিৎ চক্রবর্তী

১৯৭০ সাল। সমগ্র বাংলায় অতিবাম নকশাল আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলনের সক্রিয়তায় পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্র তছনছ। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতায় আক্রান্ত বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৭ সালে জন্ম নেওয়া রাজনীতির জগতে নবজাত নকশালবাড়ি আন্দোলন এক দৈত্যাকার রূপ নিয়েছে। শ্রেণীশত্রু 'খতমের' নামে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে স্বাবলম্বী পশ্চিমবাংলার মানুষ যেমন আক্রান্ত, অত্যাচারিত, সেরকমই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় তৎকালীন অতিবাম কমরেডরা সক্রিয়। অসহায় শিক্ষকরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অপমানিত, আক্রান্ত।

কলকাতায় নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ। শীঘ্রই এই অরাজক আন্দোলন এবং খতমের রাজনীতি অন্যান্য মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার বাইরের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৬৮-৬৯ থেকে এই অতিবাম রাজনীতি তুঙ্গে ওঠে। নকশাল ছাত্রনেতাদের তাণ্ডব ও নিগ্রহ থেকে বাঁচতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যকে আন্দোলন চলাকালীন শৌচাগারে পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে গোষ্ঠীসংঘর্ষ যেমন চরম আকার নিয়েছিল, রাজনৈতিক মতভেদের কারণে সেই সময় বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে নিত্যদিন বোমাবাজি এবং ক্লাস বয়কট লেগেই ছিল। ছাত্রদের হস্টেলগুলি হয়ে উঠেছিল রাজনীতির দাদাদের আখড়া। অবশ্যই প্রাধান্য ছিল অতিবাম রাজনৈতিক দাদাদের। প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সেই সময় বহু হস্টেলে পাইপগান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম অস্ত্র মজুত হতে থাকে। নকশাল আন্দোলনের তৎকালীন নেতাদের মদতে এবং প্রশ্রয়ে ছাত্রদের হাতে উঠে আসে আগ্নেয়াস্ত্র।

অবস্থার চরম অবনতি হয় ১৯৭০ সালের শুরু থেকে। এই অতিবাম আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে ধ্বংসলীলা। প্রতিদিন মানুষ খুন হতে থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কলকারখানায় শুরু হয় উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলন যার ফলে বহু কলকারখানা বন্ধ হতে শুরু করে। শিল্প ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে ভারতে পশ্চিমবাংলার মান ছিল উঁচুতে। এই নকশাল আন্দোলনের জেরে পশ্চিমবাংলার অধোগতির সূচনা হয়। নকশাল আন্দোলনের জেরে যখন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা তুঙ্গে, সেই সময় শিক্ষাজগতের সব থেকে কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে অবসর নেবার ঠিক আগে আততায়ীর গুলিতে ক্যাম্পাসের মধ্যেই নিহত হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. গোপাল সেন। তাঁর অপরাধ? তিনি ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন বলে শোনা যায়। ড. গোপাল সেনের বর্বরোচিত হত্যায় দেশ বিদেশের সমগ্র শিক্ষাজগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সর্বত্র নিন্দার ঝড় ওঠে। অতিবাম রাজনীতির কাঠগড়ায় বলি হন এক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি তৎকালীন ছাত্রমহলে ছাত্রদরদি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাম রাজনীতির সক্রিয়তা তখন থেকেই

সর্বজনবিদিত। ১৯৭১-৭২ এর পর নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। ধীরে ধীরে সময় বদলায়; রাজনীতির পালাবদলে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এসে মসনদ দখল করে। তখন থেকেই শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রের মেরুকরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাম আন্দোলনের সক্রিয়তা কিয়দংশে কমে গেলেও সুপ্ত থাকে আর প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় বামপন্থী মেরুকরণ। সূচারু রূপে অধ্যাপক সংগঠনকে এবং কর্মচারী সংগঠনকে নিজের কবজায় আনতে সক্ষম হন বাম নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদগুলি ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে বিশেষ কিছু আধিকারিকদের দখলে যারা বামপন্থী নেতাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ অথবা সরাসরি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৮০-র দশক থেকেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় বামনেতা ঘনিষ্ঠ উপাচার্য, সহ উপাচার্য নিয়োগ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫-৮৬ সালের মাঝামাঝি উপাচার্য করে নিয়ে আসা হয় এমন একজন শিক্ষককে (তিনি পরে বামফ্রন্ট সরকারের একজন পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছিলেন) যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম মেরুকরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে প্রশাসনের সহায়তায় প্রায় সমস্ত অ্যাকাডেমিক বা শিক্ষা সংক্রান্ত শীর্ষপদে ও বহু প্রশাসনিক পদে বামপন্থী নেতাদের পছন্দের মানুষরা বসতে শুরু করেন।

পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকারের শাসনকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক দিক থেকে থাকে দ্বিধাবিভক্ত। একটা বড় অংশ থাকে অতিবাম রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক এবং সরকার বিরোধী। অন্য অংশের মধ্যে সরকার পক্ষের বামনেতাদের প্রভাব এবং একটা ছোট অংশের মধ্যে ভেঙে যাওয়া নকশালপন্থী আন্দোলনের উগ্রপন্থী নেতাদের প্রভাব দেখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দেখা যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে অতিমাত্রায় রাজনীতির প্রভাব এবং রাজনৈতিক নেতাদের সরাসরি মদত।

পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অতিবাম রাজনীতি প্রায় বিলুপ্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রভাব আজও বিদ্যমান। এর পিছনে কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই আসবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা। একথা অনস্বীকার্য যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ অতিবাম রাজনীতির ধারক এবং বাহক। বিভিন্ন সময় সরকারের এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এরপর এক সময় পড়াশেষে পাশ করে চলে যায়; কিন্তু শিক্ষকরা থেকে যান। ফলে অতিবাম আন্দোলন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি এক দীর্ঘস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে মনে হয় অতিবাম আন্দোলনের তাৎক্ষণিক উন্মাদনা এবং সিনিয়রদের দ্বারা 'মগজ ধোলাই' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উগ্র আন্দোলনের ফুয়েল হিসেবে কাজ করে। এর ব্যতিরেকে প্রশাসনিক ঢিলেমি, অ্যালামিনিদের প্রভাব ও রাজনৈতিক মদত তো আছেই।

কারণে অকারণে এবং বিভিন্ন অছিলায় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত ক্ষতিকর দিক হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নারকোটিক্স এবং বিভিন্ন রকম নেশাভাঙ করার মুক্তাঞ্চল। বিকেল- সন্ধ্যা হতে না হতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রচুর বহিরাগতর আনাগোনা শুরু হয়। কিছু ছাত্রের মদতে এবং বহিরাগতর উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, দালানে বসে নেশার আসর। রাতে দীর্ঘসময় এই আসর চলে। বহু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী সন্ধ্যায় ভয় পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু জায়গা দিয়ে চলাফেরা করতো।এক সময় পশ্চিমবাংলা ছিল ছাত্রসংস্কৃতির পীঠস্থান। অতিবাম রাজনীতির করালগ্রাসে এবং বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক মেরুকরণের তাগিদে সেই ছাত্র সংস্কৃতি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও এর শিকার। যখন তখন কারণে অকারণে ছাত্র ইউনিয়নগুলির স্বেচ্ছাচার মূলক আচরণ এবং প্রশাসনকে পঙ্গু করার অপচেষ্টা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিত্যকার ঘটনা। বিশৃঙ্খলা এবং আন্দোলনের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের মান ক্রমেই নিম্নগামী। বহু শিক্ষক হতাশাগ্রস্ত। সাংস্কৃতিক এবং গঠনমূলক কাজে ছাত্রদের পাওয়া দুষ্কর কিন্তু যে কোনও বিষয়ে আন্দোলনে ও অবস্থানে দেখা যায় ছাত্র সমাবেশ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনে বহুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পড়াশুনার ক্ষতি হয়েছে। জনমানসে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সময় এসেছে যাদবপুরের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার। অতিবাম রাজনীতির রাহুর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজকে। পড়াশুনা এবং গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। কিছু সময় আগে এমনটাই শোনা গেছিল যাতে অনেকের মনে হয়েছে বোধহয় কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের দেশবিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী ও আধিকারিকদের একযোগে এগিয়ে আসতে হবে যে কোনও দেশবিরোধী শক্তির মোকাবিলায়। প্রশাসন এবং সরকারকেও যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ছাত্র, শিক্ষক, আধিকারিক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের একযোগে প্রচেষ্টায় যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান ফিরে, ঠিক সেরকমই ছাত্র সমাজকে নিজেদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারতবর্ষের এই সংকটকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অতিবাম রাজনীতি পরিহার করে জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাই।

(লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

বুদ্ধিজীবীদের বশ করে বিভাজন ঘটাতে তৎপর মাওবাদীরা

রূপসনাতন রায়বর্মণ

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে মাওবাদীরা— একথা বলেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। ২০১৩ সালের হিসেব বলছে, এদেশে ৭৬টি জেলা মাওবাদী অধ্যুষিত এবং ১০৬টি জেলায় তাদের আদর্শের প্রভাব রয়েছে প্রবলভাবে। মনে রাখাতে হবে, এ তথ্য কিন্তু বিজেপি সরকারের আগেকার আমলের। অতি বামপন্থীদের অতি সক্রিয়তা এ আমলে যে আরও বেড়েছে, বিচিত্রগামী হয়েছে, সে তো চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়।

আদর্শ? ঠিক কেমন জিনিস সেটা? মতাদর্শের গতিবিধি চর্চা করতে বসিনি এখানে। নেহাতই ছোটো ছিলাম, নকশালবাড়ি আন্দোলনের শুরুর সময়। ১৯৭৭ সালের পর যখন শান্তিকল্যাণ— কেন্দ্রে জনতা ও রাজ্যে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার, বন্দিমুক্তি ঘটেছে ব্যাপকহারে, কমরেড বেশি রেড কোনও বাছবিচার করা হয়নি— তখনকার আমলের

নৈরাজ্যই এখন প্রেসিডেন্সির বৈশিষ্ট্য।

স্কুলের উঁচুক্লাসের একটি দুপুর মনে পড়ে। কলেজস্ট্রিটে বিখ্যাত সরকারি স্কুল। দুটি ক্লাসের ফাঁকে দু-তিনটি যুবক খুব দ্রুত কিছু লিফলেট ছড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। এমনিতে হয়তো খেয়াল করতাম না— কতরকম হ্যান্ডবিলই তো দিয়ে যায় কত লোকজন; কিন্তু ক্লাসের উজ্জ্বল ছেলেরা খুব দামি দামি কিছু কথা বলে তাদের থামাতে চাইছে, তারা কোনও জবাব না দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে— ঘটনাটা মনে আছে এই জন্যেই। দামি প্রশ্নগুলো ছিল এইরকম : একটা বাস কিংবা ট্রাম আগুনে পুড়িয়ে, দেশ কীভাবে এগোবে? যদি ইউনিভার্সিটি কী স্কুল-কলেজের অফিস তছনছ করেন, তাহলে ক্ষতি তো ছাত্রদের, দেশের কার কী? এগুলো তো হঠকারিতা! কে কীভাবে এগোয়ে এসব করে?

এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে আলগা জবাব দিচ্ছিল কেউ কেউ, কিন্তু সমবেত উজ্জ্বল ছাত্রদের প্রতিরোধের সামনে, শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল, যেন তারা পালাতে পারলে বাঁচে। কেন কে জানে, গ্লানিটা এসে লাগল নিজেরই গায়ে। ওদের এই পালিয়ে যাওয়া, যেন আমারই কোথাও হেরে যাওয়া হলো।

> জে এন ইউ থেকে যাদবপুর, হ্যাঁ, তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তির কলরবই শুধু হয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিকতার চর্চা হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে মানবীবিদ্যার। পরিবেশ সচেতনার উদ্যোগও আছে— কিন্তু আড়ালে আড়ালে, এসব যে এ দেশের গরিবগুর্বোর কম্ম না, এই অ্যাটিচুডও কি নেই?

উজ্জ্বল সহপাঠীদের মতন আমি তো আদ্যোপান্ত কলকাতার ছেলে নই। সম্পন্ন জেলাশহরের প্রান্তে আমার স্কুলে রাজনীতির আঁচ লাগেনি কোনও। যদিও জেলা হরেকৃষ্ণ কোঙার কী বিনয় চৌধুরির, আর শহরও বিখ্যাত সাঁইবাড়ি কাণ্ডে। কলকাতার কলেজস্ট্রিট, সেখানে নানারকম বিপ্লবের গল্প ও ছবি বেশ রোম্যান্টিক আবেশ আনত মনে, বড়দের নানারকম গল্প শুনেই হয়তো। ট্রাম পুড়ছে, দোতলা বাস জ্বলছে ইউনিভার্সিটির সামনে, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মস্তক ভূলুণ্ঠিত— কাগজে এসব ছবি দেখতে দেখতেই বড় হয়েছি। 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় মন থেকে আঁকতে দিলে শিশুরা কেউ কেউ চৌকো খোপ খোপ সেন্টিনারি বিল্ডিংয়ের সামনে হিজিবিজি করে জ্বলন্ত বাস আঁকত— সেও স্বাভাবিক। সেই জমজমাট বিপ্লবের মূল ভূমিতে পড়তে এসেছি এগারো-বারো ক্লাস, আর আশৈশব সংবাদ শিরোনামে থাকা আগুনখোর বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কী না এমন বিবর্ণভাবে আমার দেখা হলো, এমনই পরাস্ত ভঙ্গিতে পালিয়ে গেল তারা!

ঘটনাগুলো বিশদ বলছি, নানান প্রজন্মের মানসিক অবস্থাটা বোঝাতে। আমার সেই উজ্জ্বল সহপাঠীরা সেদিক থেকে এ দিকে তো নানান উজ্জ্বল পেশাতেই প্রতিষ্ঠিত— কে কোথায় ছিটকে গেছে খবর রাখি না তত। নিশ্চয়ই তারা সেদিনকার মতন আজও কনফর্মিস্ট। যা চলছে, ভালোই তো চলছে, দিব্যি তো আছি, এমনই মনোভাব। আবার আমার মতনও আছে কেউ কেউ, ছোটবেলার দূরত্বে ওইসব ঘটনা দেখেছে বা পরে জেনেছে, তাই পড়ে জানবার সাধ জেগেছে বড়বেলায়। তাত্ত্বিক তর্কে সেইসব পরিসংখ্যান তো আর ধরা থাকে না, শুধু গল্পে উপন্যাসে একটু একটু জেনে যাই, ছাপোষা কনস্টেবল কিংবা উজ্জ্বল ছাত্র খুন হয়ে গেলে কিছু কিছু পরিবার কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাও, কনস্টেবলের কথা কেউ সেভাবে লেখে না। উজ্জ্বল ছাত্রদের শেষ হয়ে যাওয়া কী বিদেশ চলে যাওয়ার জন্যেই যে আজ এ রাজ্যে নেতৃত্বের এমন শূন্যতা— এই হাহাকারেই কাব্য-গল্প-সন্দর্ভ রচিত হয় বেশি।

ঠিক এইখানেই রয়েছে বিপদটা। মেধাজীবী উচ্চমার্গীয় জনগণ জানেই না কীভাবে বাঁচে নিম্নবর্গীয় লোকজন। সেই গত শতকের ষাট-সত্তর দশক থেকে আজ অবধি চিত্রটা একইরকম। হ্যাঁ, সেই আট দশকের শুরুতে, আমাদের কলেজবেলাতেও সক্রিয় ছিল নকশালপন্থীদের সেকেন্ড সেন্ট্রাল কমিটি। রোমান্টিক আবেশে, নিজেদের শ্রেণীচ্যুতি ঘটিয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে আরেকবার যারা গিয়েছিল, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো অচিরেই। তাদের মুখেই শুনেছি, গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। আজ অবধি, নোনাডাঙা আন্দোলনে জড়িত এক অনুজপ্রতিম যুবক যখন দলের ভেতরকার খেয়োখেয়ি ও স্বার্থপরতার কথা বলে, শুনে আমারও হতাশ লাগে। কিন্তু বাস্তব তো এইরকমই! আর এই রন্ধ্রপথেই তো এসে পড়ে নানান বাইরের প্রভাব— লুটেপুটে খাবার জন্য যারা ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়। ওই হতদরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করেই এতকিছু!

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্ট লবির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ অস্তমিত। তবু, ওই নকশাল-আন্দোলনের শুরুর দিকে একটু যদি ফিরে দেখি, ঘরোয়া লড়াইগুলো তখন বামপন্থীদের মধ্যেই বেশি হতো, ফিকে রেড, কমরেড, বেশি রেড। সিপিআই ভেঙে সিপিআইএম, তারপর এম এল। আর এস পি, ফরওয়ার্ডব্লক। যুক্তফ্রন্টে যুযুধান দুই প্রধান বাম দল। জ্ঞাতিশত্রুতা বা কাজিনকুলের কোন্দলের উপমা দিতেন কেউ কেউ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহচর সিপিআই— সোভিয়েত দাদারা বলেছেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে যাই, এমনই অবস্থাটা। শ্রীমতী গান্ধীও কিন্তু চীনপন্থী দলকে বিশ্বাস করতেন না। শোনা যায়, নকশাল আন্দোলনকে তোল্লাই দিয়ে চীনের লক্ষ্য ছিল আমাদের রাজ্য তথা দেশের ওই চিকেনস নেক-এর দিকে। বারাউনি তৈল শোধনগারের পাইপলাইন, অসম রাজ্য থেকে আমাদের ওই দিনাজপুর জেলার মাটির তলা দিয়েই তো! ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীন রীতিমতো নাস্তানাবুদ করেছে ভারতকে। হেসে খেলে তারা অসম-কোচবিহার সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দখল নিতে পারত। ইঙ্গ-মার্কিন চাপে যুদ্ধবিরতি হয়েছে, এতটা না বললেও দুর্বল প্রতিবেশীকে নিয়ে খেলা করতে আজ অবধি তো কেউ বাধা দেয়নি!

একাত্তর সালের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বরুণ সেনগুপ্তর রচনায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা জেনেছি। পাকিস্তানের জুলফিকার আলি ভুট্টো অনেক ব্যাপারেই অনেকদিন থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আমেরিকা নাকি চাইত, ভুট্টোর সঙ্গে আয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খান— সেনাপ্রধান যিনিই হোন, একটা দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখতে। ভুট্টো কিন্তু বুঝেছিলেন, আমেরিকা-রাশিয়া, কোনও লবিই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কাজে লাগবে না। ভারতের ক্ষতি করতে যোগ্য সহচর সে একমাত্র চীনকেই পেতে পারে। আজ পাকিস্তান ও চীন অধিকৃত কাশ্মীরে হাইওয়ে তৈরির বাস্তবতার নিরিখে, এটা কি আমরা দেখছি না?

ভারতবর্ষে নানা ভাষা, নানা মত— বুদ্ধিজীবী উচ্চমার্গীয়দের কাছে তাই এ দেশীয় সবকিছুই ঈষৎ গ্রাম্য, দুর্গন্ধী। জে এন ইউ থেকে যাদবপুর, হ্যাঁ, তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তির কলরবই শুধু হয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিকতার চর্চা হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে মানবীবিদ্যার। পরিবেশ সচেতনার উদ্যোগও আছে— কিন্তু আড়ালে আড়ালে, এসব যে এ দেশের গরিবগুর্বোর কম্ম না, এই অ্যাটিচুডও কি নেই?

মাওবাদী কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা ২০০৪ সালের একুশে সেপ্টেম্বর। পিপলস ওয়ার গ্রুপ সিপিআই (এম এল) এরই ভিন্ন নাম। এটি ওই বছরই অক্টোবরে মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার অব ইন্ডিয়া (এম সি সি আই) এর সঙ্গে মিশে যায়। সাধারণ সম্পাদক রূপে ঘোষিত হয় মুপ্পালা লক্ষ্মণ রাও ওরফে গণপতির নাম। আবারও বলি, এই সবই কিন্তু মোদী-জমানার অনেক আগের ঘটনা।

দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এলে অতি-বামদের রং কীভাবে পরিবর্তিত হয় জানা নেই। কিন্তু দেশজোড়া আর্থিক অসাম্য, বেকারত্ব ও স্থবিরতা ভুলিয়ে দিয়ে শুধু ধর্ষণ আর গোমাংস, শুধু হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব ও ওইসব নিয়েই হিন্দুত্ববাদীদের গালাগালি, এর আড়ালে কোন খেলা খেলছে মরণ-খেলার খেলোওয়াড়রা, তার খবর আমরা কজন রাখি?

ছিলা-টানটান দাঁত-কিড়মিড় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোলাহলে চাপা পড়ে যায় ভয়ংকর সত্যগুলো। মুসলমান মৌলবাদ দেখা যায়, বোঝা যায়। পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে। তবু, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব কিছুটা কাজিনকুলের কাজিয়ার মতন। যে কোনও ইসলামি দেশের চেয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। তাদের বড় অংশই কনভার্টেড। মূলবৃক্ষের নানান শাখাপ্রশাখা। আবেগের তোড়ে যে যাই বলুক ভারত ভাগ শুধু মুসলমানদের জন্য হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের বশ করে, কলমকে অবশ করে দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি কিন্তু বিভাজন ঘটাতে আজও সক্রিয়। ■

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী নন

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ভালোভাবে না পড়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কিছু ব্যক্তি তাঁকে কলঙ্কিত করে থাকে এবং বঙ্কিম না-পড়া আহাম্মকরা সেটাই বিশ্বাস করে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুক্তবুদ্ধি মানুষের জন্য সেটা চরম দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

আই পি এস ড. নজরুল ইসলাম, যিনি নিজেকে সেকুলার ও ন্যায়বাদী সংগ্রামী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সদা সচেষ্ট, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তাঁর 'মুসলমানদের করণীয়' পুস্তিকায় অনেক মিথ্যা কথা লিখেছেন যা তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক। তার প্রতিবাদে আমি তাঁকে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম। তিনি তার জবাব দিতে পারেননি। প্রখ্যাত রাজনীতিক তথাগত রায়ও তাঁর পুস্তিকার প্রতিবাদে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, যা দৈনিক স্টেটসম্যান (৩১.১০.২০১২) প্রকাশ করেছিল। নজরুল তারও জবাব দেননি।

প্রাসঙ্গিক বলেই নজরুল সাহেবকে লেখা আমার সেই চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম—''পণ্ডিত ও সাহিত্যিক শিরোমণি প্রমথনাথ বিশী লিখিত 'সাক্ষাৎকার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে' পড়লে জানতেন, বঙ্কিমচন্দ্র উচিত কথায় কাউকে ছাড়তেন না। তাই তিনি বিদ্যাসাগর, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাদী, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, ইংরেজ নির্বিশেষে সকলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র হাসিম শেখের কথাই আগে লিখেছেন, হিন্দু রামা কৈবর্তের কথা পরে লিখেছেন।'' দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের ওসমান ও আয়েশার চরিত্র দুটি জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল ও মহান করে সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এটা কি মুসলমান বিদ্বেষ? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের কোথাও মুসলমানদের ছোট করেননি।

—কমলাকান্ত বণিক,
নিবাধুই স্কুলপাড়া, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

বাংলাদেশ ভবিষ্যতে হিন্দু-বিদ্বেষী হবে

একটি দৈনিকের খবরে প্রকাশ সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরব সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে আরবের বাদশার কাছে আব্দার করলেন দেশজুড়ে মসজিদ আর ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান। বাদশাহ ১০০ কোটি ডলার অনুদান দেওয়ার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে তাঁর মন্ত্রী পরিষদকে নিয়ে ঠিক করেন দেশজুড়ে ৫৬০টি মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়া হবে। পরে কোনও কারণে সৌদি সরকার সে অনুদান দিতে অস্বীকার করলেও শেখ হাসিনা তার মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে এই প্রকল্প তারা নিজেদের অর্থেই রূপায়িত করবেন। এর জন্য খরচ হবে ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু প্রকল্প-সহ হজযাত্রী ইমামদের জন্য থাকবে বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এবার হিসেব করা যাক। বাংলাদেশে মোট জেলা---৬৪, উপজেলা—৪৯০। এই উপজেলা (২০১৭ থেকে) হচ্ছে পুরনো থানা স্তরের। তাহলে ৫৬০টি মডেল মসজিদ তৈরি করতে গেলে কোনও কোনও থানায় ২টি করে মসজিদ ভাগে পড়বে। বর্তমানে যত মসজিদ আছে তার সঙ্গে এগুলি যুক্ত হবে, সঙ্গে থাকবে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এর অর্থ হলো পুরো বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জালে ছেয়ে ফেলা হচ্ছে। অন্যত্র ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ করা হবে ৪৯৭ কোটি টাকা। মাদ্রাসার কথা তো এখানে উল্লেখই নেই। একবার ভেবে দেখুন আজ ভারতবর্ষের সরকার হিন্দু মন্দির

চিঠিপত্র

নির্মাণ, পুরোহিত প্রশিক্ষণ, হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যদি এমন কোনও প্রকল্প নেয় তবে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে! এখানেও মুসলমান সংখ্যালঘু। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কে কত সুযোগ সুবিধা দেবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চালায়। দেখে শুনে মনে হয়, সংখ্যাগুরু (নামে, অধিকারে নয়) হিন্দুদের এদেশে ধাক্কা খাওয়াই ভবিতব্য।

মনে অবশ্যই প্রশ্ন আসে, যে বাংলা দেশকে ভারতবর্ষ রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে তৈরি করে তাদের উপহার দিল, আজ সেখানে হিন্দুদের ওপর, হিন্দুমন্দির, হিন্দু নারীর উপরে অত্যাচারের সীমা নেই। হিন্দুদের মান, প্রাণ, ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে আসার সেই প্রবাহ চলছে ধারাবাহিক ভাবে। আজ বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮.৫ জন, যা স্বাধীনতার সময় ছিল ২২.০৫ শতাংশ (১৯৫১)। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশও যে পুরোদস্তুর হিন্দু বিদ্বেষী, ভারতবিরোধী এক দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশ হবে উল্লেখযোগ্য জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আজ বাংলাদেশের প্রতি ভারতকে কঠোর মনোভাবাপন্ন হতে হবে। সেখানকার হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব ভারতেরই। আর তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে ভারত সরকারকে।

—বিমলকৃষ্ণ দাস,
শিলিগুড়ি।

ভিএইচপি ও বজরং দল উগ্রবাদী ধর্মীয় সংগঠন নয়

খবরে প্রকাশ, মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা

(সিআইএ)-র দৃষ্টিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল জঙ্গি সংগঠন। ভাবা যায়? সি আই এ-র ঔদ্ধত্যের নিন্দার ভাষা নেই। বলিহারি এদের দৃষ্টিভঙ্গিও। তা না হলে এহেন অন্যায্য মত প্রকাশ করতে পারে তারা? গুপ্তচর বৃত্তিতে এরা বিশ্বসেরা। এদের কাজই হচ্ছে, আমেরিকা-বিরোধী দেশে অতি গোপনে ঘাঁটি গেড়ে জনতার মধ্যে সরকার-বিরোধী প্রচার চালিয়ে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা। আর এভাবেই এরা বহু মার্কিন-বিরোধী রাষ্ট্রের সরকারের পতন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রের মূল পাণ্ডা ছিল নাকি এই সি আই এ। কারণ মুজিব বাংলাদেশকে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যা ছিল মার্কিন নীতি বিরোধী। এরাই আবার বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে একদা গোপনে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার চালিছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই সোভিয়েত রাশিয়া-সহ প্রায় এক ডজন কমিউনিস্ট দেশে ১৯৯১ সালে কমিউনিজমের পতনের জন্য সি আই এ বহুলাংশে দায়ী।

সি আই এ সম্প্রতি তাদের 'ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক'-এ ভি এইচপি ও তার অঙ্গ সংগঠন বজরং দল সম্পর্কে মিথ্যে ও উদ্দেশ্যপ্রণদিত ভাবে উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংগঠন বলে মত প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ, সি আই এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গি সংগঠন তালিবান, আই এস, আলকায়দা, জামাত-উদ্-দাওয়া, হিজবুল মুজাহিদিন, জয়েশ-ই-মহম্মদ ইত্যাদির সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে। বিশ্ববাসী জানে, ইসলামিক জঙ্গিরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রশিক্ষণ পায়। তারা সর্বদা সশস্ত্র, 'কাফের' নিধনই তাদের 'জেহাদ'। জঙ্গি আস্তানায় তারা বন্দি নারীদের উপর চালায় পৈশাচিক যৌন নির্যাতন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামিক বিশ্ব নির্মাণ। পক্ষান্তরে, যে ভি এইচ পি ও বজরং দলের অনুগামীরা হিন্দু ধর্মের মানবতা, সহিষ্ণুতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে। সি আই এ ভি এইচ পি ও বজরং দলকে যেসব কারণে উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংগঠন বলেছে সেসব কি সত্যি যুক্তিগ্রাহ্য? ধোপে টেকে কি? ভি এইচ পি-র উচিত সি আই এ-র বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া।

সত্যি বলতে কী, হিন্দুস্থান, হিন্দু ও হিন্দুত্ব নিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক গভীর ষড়যন্ত্র। হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্মের মহানতা, মানবতা, মহানুভবতা তথা বিশ্বগ্রহণ যোগ্যতা খর্ব করতে 'Semitic' ধর্মবাদীরা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কড়া নজরদারি, প্রচার, জনসংযোগ ও জনগণকে সচেতন করার ফলে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ প্রায় বন্ধের মুখে। উপরন্তু লক্ষ লক্ষ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ভি এইচ পি-র উদ্যোগে ফিরে এসেছেন স্বধর্মে। আর এই সব ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ভ্যাটিকান এবং ভারত-সহ বিশ্বের খ্রিস্ট-ধর্মযাজকরা। আর সেই ক্ষোভের ঢেউ সম্ভবত গিয়ে লেগেছে সি আই এ দপ্তরে। তাই হয়তো ভি এইচ পি-বজরং-এর ঘাড়ে এই বদনাম চাপানো। তাছাড়া ইসলামিক জঙ্গিদের বদনাম কিছুটা ঘোচাতে এবং মোদী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে এহেন অপপ্রচারের তারা আশ্রয় নিতে পারে। বিশ্বে সি আই এ-র দু' মুখো নীতি ও কুকীর্তি অনেকেরই জানা। এই সি আই এ-ই একদা আফগানিস্তানে রুশপন্থী সরকারের পতন ঘটাতে তালিবানকে মদত দিয়েছে। আলকায়দার জনক লাদেন এদেরই সৃষ্টি। ইরাক যুদ্ধে এরাই আই এস এবং ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছে। সিরিয়া ও তুরস্কেও একই কাজ করছে। এরাই আবার ভারতের মানচিত্র থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে বাদ দিয়েছে। আসলে সি আই এ হচ্ছে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। তাই প্রত্যেক হিন্দুর উচিত ভণ্ড সি আই এ-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

২০১৯-এ মোদী বনাম খিচুড়ি জোট

কোনও দিশা, কোনও লক্ষ্যমাত্রা বা কর্মসূচির দরকার নেই। মোদী হঠাও, হটাও বিজেপি— তাই একত্র হও। একক শক্তিতে মোদীর বিজয়রথ এবং বিজেপির শক্তি মোকাবিলা কোনও মতেই সম্ভব নয়। তাই রাহুল-সোনিয়া, মায়াবতী, মুলায়ম, অখিলেশ, মহাঠগী লালু যাদবের সুযোগ্য পুত্র তেজস্বী, (যদিও লালুবাবুর দুই পুত্রের মধ্যে শুরু হয়েছে খেয়াখেয়ি), কর্ণাটকের সুবিধাবাদী দেবেগৌড়া, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং ব্যক্তিনির্ভর কিছু আঞ্চলিক দলের নেতা মার্কসবাদী সীতারাম ইয়েচুরী একত্র হলেন সবাই কর্ণাটকের 'জে ডি এস-কংগ্রেসের' অনৈতিক সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে। সহাস্য বদনে একত্রে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন, মাঝে মাঝে মায়াবতীকে সোনিয়া জড়িয়ে ধরছেন। যেন জোট একটা হয়ে গিয়েছে এবং মোদীর পতন আসন্ন, পুত্র রাহুল প্রধানমন্ত্রীর কুর্শিতে বসতে চলেছেন।

ইতিপূর্বে দিল্লিতে রাহুলগান্ধী প্রকাশ্যেই নিজেকে প্রধানমন্ত্রী দাবিদার হিসাবে ঘোষণা করেছেন। পরপরই অঙ্গুলি তুলে তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, অন্য কেউ নয় একমাত্র তাঁর পুত্র রাহুলেই বাঁচাতে পারে ভারতবর্ষকে। তাই এই নেতাদের নিয়ে একটা 'খিচুড়ি জোট' করার প্রয়াস চলেছে। এরা সবাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে কোনও অনৈতিক অবস্থান নিতে পিছু পা হবেন না। যদিও মোদীর রাজনৈতিক ক্যারিশমা এবং জনমোহনী শক্তির ধারে কাছে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

এই পরস্পর বিরোধী নেতারা যে 'খিচুড়ি জোট' গঠন করতে চান তার নেতা কে? নাকি আমরা সবাই নেতা আমাদের এই 'খিচুড়ি জোটে'। মোদীর ভয়ে ভীত বামনেতারা চাইছেন হোক না একটা 'খিচুড়ি জোট', তাতে না হয় পাওয়া যাবে একজন দেবেগৌড়া কিংবা একজন চন্দ্রশেখর, না হয় তো ইয়েচুরি। কয়েক মাসের প্রধানমন্ত্রী হলে মন্দ কী? এবার আর কারাত-ইয়েচুরিরা কোনও ঐতিহাসিক ভুল করবেন না। হোক না কলরব, তবু একটা খিচুড়ি জোটের উগ্র আকাঙ্ক্ষা ইয়েচুরিদের!

—তুষারকান্তি সরকার,
কোচবিহার।

প্রকৃতি ও মানবজীবন অবিচ্ছিন্ন

সুতপা বসাক ভড়

একটু ভাবুন, মাত্র কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের বাসস্থান পৃথিবী কেমন ছিল? সেখানে কলকল করে বয়ে যেত নদী, চতুর্দিকে ছিল সবুজের শ্যামলিমা এবং বিশুদ্ধ আবহাওয়া। এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর আনাগোনা প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলত। প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য বজায় ছিল তখন। জল, জঙ্গল, কৃষি এবং জীবজন্তু সমেত সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এক নিশ্চিত এবং ভারসাম্য বজায় ছিল। পানীয় জলসংকটের মতো শব্দ তখন শোনাই যেত না। হাওয়া যে কখনও দূষিত হতে পারে এমন ধারণা তখনকার লোকেদের ছিল না। দূষণ কী, স্বাস্থ্যের ওপর এর কীরকম নীতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, তা তখন চিন্তারও অতীত ছিল। তখন কী একবারও ভাবা হয়েছিল যে কয়েক বছরের মধ্যেই কখনও পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষা নিয়েই সংশয় দেখা দেবে?

অথচ আজ? জল-দূষণ দিনে দিনে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। বিশুদ্ধ জলাশয় খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, যেকটি আছে তাও ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে চলেছে। চতুর্দিকে সবুজের পরিবর্তে কংক্রিটের জঙ্গল আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকৃতিতে জল, জঙ্গল এবং জমির মধ্যে যে আত্মিক সামঞ্জস্য ছিল, তা যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিবেশ দূষণ একটি ক্রমবর্ধমান ব্যাধির মতো প্রকৃতিকে আক্রমণ করে চলেছে। আজ বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো শব্দ আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে পৃথিবীর অস্তিত্বই আজ সংকটময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকটের ব্যাপারে আমরা সবাই কমবেশী ওয়াকিবহাল। প্রকৃতপক্ষে আমাদের লোভ-লালসাই এর কারণ। আমরা জ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি অবিবেচকের মতো দোহন করে চলেছি; অথচ প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্য কখনই করিনি। প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্বও নিতে চাইনি। আর এখন? এই পরিস্থিতিতে একমাত্র কঠোর

আইন বানিয়েই প্রকৃতিকে রক্ষা করা যেতে পারে। এমন আইন হতে হবে, যাতে প্রত্যেকের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ব্যবহারের নিশ্চিত মাত্রা ঠিক করে দেওয়া থাকে, প্রকৃতির ক্ষতি করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত সেখানে।

ভবিষ্যতে বিশ্ব পরিস্থিতি মেকাবিলা করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। প্রকৃতির এই ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ হলো প্রকৃতি থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার ফলেই এই বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়েছে। আজ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বিচ্ছেদ দূর করা ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে এই বিচ্ছেদ আমাদের জীবন এবং চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করে চলেছে। আমরা প্রকৃতি এবং পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্য এখানে বিচ্ছেদের কোনও স্থানই নেই এবং আমাদের পৃথক অস্তিত্বও সম্ভব নয়।

প্রকৃতিকে শেষ করে দেবার এই ভাবনা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল। আসলে, এই ধরনের ভাবনা তখনই মনে এসেছিল, যখন প্রকৃতিকে প্রারম্ভিক সময় থেকেই জড় ও মৃত পদার্থ বলে মানতে শুরু হয়েছিল। আলাদাভাবে পৃথিবীকে শেষ করে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আর ওঠে না।

এই যে মানসিকতার সূত্রপাত হলো, এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হতে থাকল। এই ভাবে আমরা প্রকৃতির নয়, বরং নিজেরাই নিজেদের বিকাশের পথ রুদ্ধ করতে চলেছি।

এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যে। যেখানে প্রকৃতিকে জড় বা মৃত পদার্থ নয়, মা হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ, জীবজগত ইত্যাদি আমাদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। সেজন্য সেগুলিকে যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করাই আমাদের কর্তব্য। আমরা প্রকৃতি থেকে ততটুকুই নেব, যতটুকু আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। অবশিষ্টটা থাকবে আগামী প্রজন্মের জন্য। প্রকৃতি তার অমূল্য সম্পদ সাজিয়ে নিয়ে আছে আমাদের সাফল্যের জন্য। আমাদের উচিত সেই প্রকৃতিকে সম্মান করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাহলে প্রকৃতিই আমাদের রক্ষা করবে। প্রকৃতি এবং আমরা একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতিকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেজন্য আজ আমদের আবার ফিরতে হবে মাটির টানে। ■

রক্তাল্পতায় শুধু চিকিৎসকের পরামর্শ নয় নিজেকেও সতর্ক থাকতে হবে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেক সময়ই কোনও ব্যক্তির শরীরে যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকার কথা তা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। শরীরে হিমোগ্লোবিনের এই ঘাটতি বা নেমে যাওয়াকেই অ্যামিনিয়া বা রক্তাল্পতা বলে। তবে বয়স ও লিঙ্গের ওপর হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ভর করে। হিমোগ্লোবিন ঘাটতির অন্যতম দু'টি কারণ হলো ঃ (১) শরীরে স্বাভাবিক পরিমাণে রক্ত তৈরি না হওয়া। শরীরের অস্থিমজ্জায় হেম ও গ্লোবিনের সংমিশ্রণে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটলে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হয়।

(২) ভিটামিন বি-১২ ও আয়রনের অভাব। শরীরে রক্ত কমে যাওয়ার আরও কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কিডনি ও বোনম্যারো ফেলিওর সংক্রান্ত সমস্যা, অপুষ্টি, ব্লাড ক্যানসার, অর্শ, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, আঘাতের ফলে অধিক রক্তক্ষরণ, মলমূত্রের সঙ্গে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, রক্তে লোহিতকণিকা দ্রুত ভেঙে যাওয়া। ঝঞ্ঝা নামের উৎসেচকের অভাবেও অ্যানিমিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ১০০ মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো ১৩.৪ থেকে ১৫.৫ গ্রাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১২ থেকে ১৪ গ্রাম। ভারতের মতো দেশে অ্যানিমিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ হলো আয়রনের ঘাটতি। আয়রনের ঘাটতি অনেক কারণেই হয়ে থাকে। শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের অভাবে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে একাধিক বার গর্ভধারণের কারণেও এই সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অ্যানিমিয়া থেকে ভবিষ্যতে বহু মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হার্ট ফেলিওর, হেমারেজ, জন্ডিস, শরীর বিকৃত হওয়া, পায়ে ও পেটে আলসার প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অ্যামিনিয়ার উপসর্গের কারণগুলিকে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। শরীর বেশ দুর্বল লাগা, মাথাব্যথা, যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, বেশি ঘুম পাওয়া, খিদে কমে যাওয়া ইত্যাদিও অ্যানিমিয়ার কারণ হতে পারে। আবার এসব সমস্যা দেখা দিলেই অ্যানিমিয়া হয়েছে ভাবার কারণ নেই। কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। উপসর্গগুলি দেখা দিলেই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শিশুদের অ্যানিমিয়া বোঝার সহজ উপায় হলো ঠিকমতো খেতে না পারা, নিস্তেজ হয়ে পড়া, খেলাধুলায় আগ্রহ না থাকা ইত্যাদি। অ্যানিমিয়ার জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। তাই উপসর্গগুলি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন। সময়ে সতর্ক না বলে বড়ো বিপদও হতে পারে। মায়ের রক্তাল্পতা গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। প্রেগনেন্সির সময় মায়েদের সুষম খাবার খাওয়া খুবই প্রয়োজন। অ্যানিমিয়া হলে শুধু চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই হবে না, নিজেকেও সতর্ক থাকতে হবে। এই রোগের একটি বড়ো ওষুধ হলো আদর্শ ডায়েট। এটি মেনে চললে এই সমস্যাকে অনেকটাই প্রতিরোধ করা যায়। তাই খাদ্য তালিকায় বাড়তি নজর দেওয়া খুবই জরুরি। রক্তাল্পতায় কাঁচকলা, মোচা, থোর, ছোটো মাছ, ডুমুর, সবুজ শাকসবজি, কুলেখাড়া, বাদাম, খেজুর, দেশি কলা নিয়মিত খাওয়া উপকারী। হোমিওপ্যাথিতে অ্যানিমিয়ার ভালোভাবে চিকিৎসার উপায় রয়েছে। হোমিওপ্যাথি সমস্যার মূলে গিয়ে চিকিৎসা করে। ফেরাম মেটালিকাম, ফেরাম ফসফোরিকাম, ফেরাম মিউরিয়েটিকাম প্রভৃতি অনেক ওষুধ রয়েছে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যানিমিয়া প্রতিরোধে নিজে থেকে ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ■

তৃণমূল আমলে হরেক প্রকারের নকশাল

অভিমন্যু গুহ

ছয়ের দশকের এক দাপুটে নকশাল নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কলকাতার একটি বনেদি বাড়ির, একেবারে রাজবাড়ির সন্তান তিনি। ফরোয়ার্ড ব্লকের এক শ্রদ্ধেয় নেতাকে খুনের ঘটনায় নাম পর্যন্ত জড়িয়েছিল তাঁর। ক্ষোভ ভরেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— এই যে বনেদি পরিবারের ছেলে হয়ে, ভালো লেখাপড়া করে মানুষ খুনের রাজনীতি করতে লজ্জা করেনি, বিবেকে বাধেনি? কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আসলে কী জান আমরা আমাদের বিবেক চীনের কাছে বাঁধা দিয়েছিলাম। তখন কংগ্রেসি আমল। বাপ-ঠাকুরদারা পায়ের ওপর পা তুলে বিলাসব্যসনে মজে আছেন, শখের ও সুখের রাজনীতি করছেন, অন্যদিকে কলকাতা জুড়ে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল, অসহনীয় তাঁদের জীবন শিক্ষিত সমাজকে খেপিয়ে তুলেছিল। চীন ভারত আক্রমণ করছে, আর আমরা উদ্‌বাহু হয়ে নাচছি; চীনকে ভাবছি মুক্তির দূত। এরপর নকশালবাড়িতে যখন কৃষক বিদ্রোহ হলো, আমরা আর নিজেদের সামলাতে পারলাম না। মনে করলুম কংগ্রেসি বুর্জোয়াদের হঠিয়ে দেশ দখল করব। চীনা-মডেলেই খুন জখম শুরু হলো।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর কোরিয়ায় পারিবারিক কমিউনিস্ট শাসনে সেদেশের মানুষের দুর্দশার খবর রাখেন? সেকালে তো অহরহ স্লোগান তুলেছিলেন— সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। আজ চীনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র কেমন লাগে? কিছুক্ষণ আবারও চুপ করে থেকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সেই মানুষটি বলেছিলেন— যদি বল আমরা ভুল করেছিলাম, তবে বলবো সেদিনের সমাজ কাঠামোয় আমরা কোনও ভুল করিনি। তবে আজকের প্রেক্ষিতে যদি বল তবে বলবো আমাদের নাম ব্যবহার করে আজ ভুল করা হচ্ছে।

তাঁকে বোঝাতে পারিনি, খুনের রাজনীতি কোনওদিনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেই ভুল একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই। সেকালের কিছু নকশালের সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝেছি এঁরা অধিকাংশই ছিলেন, অন্তত কলকাতায়, আলালের ঘরের দুলাল এবং নিঃসন্দেহে কৃতী ছাত্র। গরিব মানুষের প্রকৃত কষ্ট বোঝার সামর্থ্য এঁদের ছিল না। হাতের কাছে খুনে-রাজনীতি করার দৃষ্টান্ত বলতে ছিল চীনের ভারত আক্রমণ। তাই 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'বন্দুকের

মাওবাদী শুভানুধ্যায়ী ?

ঝুম্পা লাহিড়ী

নন্দিতা দাস

অরুন্ধতী রায়

শোভা দে

নলই শক্তির উৎস' গোছের স্লোগান দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছিল নিজেদের তো বটেই, দেশের ভবিষ্যৎও। আরেক নকশাল নেতা, তিনিও বড়লোক বাড়ির ছেলে, আমায় বলেছিলেন— দেখ, আমাদের বাবাদের বিদ্যের দৌড় বেশি ছিল না, পায়ের ওপর পা তুলে তাঁরা পূর্বপুরুষের সম্পত্তি ভোগ করতেন। আমরা লেখাপড়া শিখে তাঁদের এই আভিজাত্যের গরিমা সহ্য করতে পারতাম না। নকশাল বাড়িতে আন্দোলন হচ্ছে, বাপ-ঠাকুরদাদের মুখ-চোখ দেখে বুঝতাম তাঁরা ভাবছেন 'ছোটোলোক'দের বাড় বেড়েছে। ব্যাস এসব দেখেই মাথায় খুন চড়ে যেত। সেই অনুপ্রেরণায় আমরাও হয়ে যেতাম নকশাল। চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ (পরে জে দঙ)-কে গুরুঠাকুর ঠাওরে পরে মাওবাদী।

কিন্তু এঁরা ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন জরুরি অবস্থার পরবর্তী সময়ে। ছয়ের দশকের শেষ কিংবা সাতের দশকের গোড়ায় নির্বিচারে নকশাল-হত্যা চলেছিল, জরুরি অবস্থার সময়ে এদের গারদে পোরা হয়। এদের লাশের ওপর ভর করেই সাতাত্তরে ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট সরকার। যতদূর জানা আছে, একমাত্র জ্যোতির্ময় বসু (ইনি জ্যোতি বসু নন) বাদ দিয়ে আর কোনো সিপিএম নেতাই জরুরি অবস্থায় সময় গ্রেপ্তার হননি। সেকালের নকশাল নেতারা সিপিএমকে তাই 'শ্রেণীশত্রু' ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। একই সঙ্গে তাঁরা মনে করেন তাঁদের আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে। কারণ একদিকে বাম-আমলে গরিব মানুষের নিপীড়ন তাঁরা দেখেছেন, অন্যদিকে যে দেশের চেয়ারম্যানকে ভারতবর্ষের চেয়ারম্যান করার নেশায় তাঁরা বুঁদ হয়ে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেই চীনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র, সেদেশেও গরিব মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার, তাঁরা এসবেরই সাক্ষী থেকেছেন। সেই আমলের নকশালীদের অধিকাংশেরই দুঃখ দুর্দশায় কেটেছে। আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের আফশোসই সম্বল। এঁদেরই কেউ কেউ একান্তে বলেন ভুলটাই তাঁদের জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বলেন নকশাল, মাওবাদ এই শব্দগুলো তাঁদের রোমকূপ আজও খাড়া করে দেয়। নন্দীগ্রামে বাম-পুলিশের বর্বরতায় যখন রাজ্য তো বটে, দেশবাসীও ক্ষোভে উত্তাল তখন আবার নকশাল-মাওবাদী যোগের কথা শোনা গিয়েছিল। পরিবর্তন যখন এল তখন জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আমলে নকশাল করা গুটিকতক মানুষের চোখ হয়তো চিক চিক করেছিল, শুধু বাম সরকারের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় নয়, তাঁদের আদর্শগত একটা টান থেকেও হয়তো বা সেই অশ্রুসজল নয়নের সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু এরপর সাত বছরে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে গত শতকের ছয়ের বা সাতের দশকের নকশাল আমলের অদর্শগত উপলব্ধির সলিল সমাধি যে ঘটেছে বলাই বাহুল্য। কিছুদিন আগে ফেসবুক হোয়াটস্ অ্যাপ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বেশ মজার মেসেজ ঘোরাফেরা করছিল। তাতে বলা হচ্ছিল আপনি যদি তৃণমূলের বুদ্ধিজীবী নেতা হতে চান তবে আপনার অবশ্যই একটা 'নকশাল ব্যাকগ্রাউন্ড' থাকতে হবে এবং তৃণমূলের যাবতীয় অপকর্মকে নকশালি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন বুথ দখল, ছাপ্পা ইত্যাদিকে প্রান্তিক গরিব মানুষের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। বাস্তবিক পরিস্থিতি আজ সেইদিকে মোড় নিয়েছে। তৃণমূলি আমলে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বেকারত্ব, কর্মহীনতা, অন্যদিকে রাহাজানি, তোলাবাজি, খুন। সব মিলিয়ে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি এখন খুব বিপজ্জনক দিকে মোড় নিয়েছে আর এর সুযোগ নিতে 'নকশাল' তকমা ব্যবহার করতে চাইছে কিছু লোক। যেমন একজন অধ্যাপক-'কবি' রয়েছেন। বাম আমলে আখের সেভাবে গোছাতে পারেননি। তৃণমূল আমলেও প্রথমদিকে পাত্তা পাচ্ছিলেন না। আজকে তিনি বিজেপি ও সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার (হেট-ক্যাম্পেন)-এ ব্যস্ত কিন্তু কে ভুলবে যে ২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপির জেতার পর এঁরই ফেসবুক ওয়াল জ্বলজ্বল করছিল 'বজরঙ্গবলী লাল সেলাম' লেখায়। আসলে 'নকশাল' শব্দের মধ্যে একটা মাদকতা আছে, যেটা খুব সুচতুর ভাবে এই আমলে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তৃণমূলে নীতি-আদর্শের বালাই নেই। একসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,শঙ্কুদেব পণ্ডারা যাদবপুর কাণ্ডে স্লোগান তুলেছিল 'মদ, গাঁজা, চরস বন্ধ, তাই এত প্রতিবাদের গন্ধ'। আবার এই দলের লোকেরাই বিদ্যার্থী পরিষদের বিরুদ্ধে যাদবপুরের নকশালিদের প্ররোচিত করেছিল। তৃণমূল তার এই স্বল্প সময়ের রাজত্বে ইসলামিক মৌলবাদীদের তোষণ থেকে ভারতীয় সেনার নিন্দা— নানা ঘটনায় নিজেদের দেশদ্রোহী ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সফল হয়েছে। আর এরই সুযোগ নিতে আবির্ভাব হয়েছে হরেক প্রকারের নকশালের। যে কবির কথা হচ্ছে তিনি বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তৃণমূলে গিয়ে জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে যে অশালীন ভাষা ব্যবহার করছেন, তা কোনও সভ্য মানুষ (অধ্যাপক বা কবি না হয় উহ্যই থাকল) করতে পারেন বলে ভাবা মুশকিল। নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্মদিনে ইনি লিখেছেন— 'নাশকতা জিন্দাবাদ'। তৃণমূল আমলে তিনি 'নকশালি তৃণমূলি' বলে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর সামাজিক অপকর্মে প্ররোচিত করছেন। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন 'ঔপনিবেশিকতা বিরোধী' নাম দিয়ে গড়ে উঠেছে আরেকটি গোষ্ঠী। এরাও এখন আগমার্কা তৃণমূলি এবং যাকে অপছন্দ হচ্ছে তাকেই 'উপনিবেশিকতাবাদের দালাল' বলে দাগিয়ে তার সামাজিক সম্ভ্রমহানি করছে। এর পাশাপাশি আছে 'বাম লিবারেল' নামধারী কিছু ব্যাক্তি। মানুষ সিপিএমকে আস্তাকুঁড়ে পাঠিয়েছে বুঝে এরা এখন মমতা ব্যানার্জিকে প্রকৃত 'মার্কসবাদী', 'ভারতীয় লেনিন' নামে ভূষিত করছে আর মানুষকে বোঝাচ্ছে আসিফা আর দিব্যা-র ধর্ষণকাণ্ড একই গোত্রে পড়ে না। প্রথমটিতে সংখ্যাগুরু বুর্জোয়াশক্তির চক্রান্ত আছে, আর দ্বিতীয়টি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ফলে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি এই আমলে যে জায়গায় যাচ্ছে, সেখান থেকে ফিরতে কত সময় লাগবে তা ঈশ্বরই জানেন।

নকশাল আদর্শের অপমৃত্যু অনেক আগেই ঘটেছিল। কিন্তু তার যে এমন করুণ হাল হবে কানু সান্যাল, চারু মজুমদারেরা কল্পনাও করেননি। করলে হয়তো সেদিন পথভ্রষ্ট হতেন না। ■

তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলির দুরবস্থা

সাধন কুমার পাল

দেশরক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। এখন কেউ তাঁদের খোঁজ রাখে না। আগে ২৬ জুন শহিদ স্মরণ করতে বহু মানুষ আসতেন। ভিড় লেগে যেতো কুচলিবাড়িতে। বিশেষ করে এই দিনটিতে মনে হতো মানুষ ভুলে যায়নি শহিদদের বলিদান। এখন সেই সংখ্যা ক্রমশই কমছে, হয়তো বা মানুষ ভুলে যাচ্ছে দেশের মাটি রক্ষার জন্য উত্তাল আন্দোলনের সেই দিনগুলিকে। বুকভরা অভিমান নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই কথাগুলি বলে গেলেন অশ্বিনী কুমার রায়, উৎপল কুমার রায়ের মতো তিনবিঘা আন্দোলনের সৈনিকরা। গত ২৬ জুন তিনবিঘায় শহিদ দিবস পালন করতে গিয়ে এই ধরনের অনেক কথাই শুনতে হলো।

দেশের মাটি রক্ষার এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নিজের দেশের পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল তিনজন গ্রামবাসী সুধীর রায়, ক্ষিতেন অধিকারী ও জিতেন রায়কে। বর্তমানে এই শহিদ পরিবারগুলির করুণ অবস্থা। কেউ দিনমজুরি করছে, কেউ বা জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে ভিনরাজ্যে। কেউ শরীরে বুলেটের আঘাতের চিহ্ন নিয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছে। আবার কেউ ধুঁকছে দারিদ্র্য ও দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে।

জানা গেল প্রতি বছরই ২৬ জুন সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি ও ভারতীয় জনতা পার্টি জলপাইগুড়ি জেলার পক্ষ থেকে তিনটি শহিদ পরিবার ও প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলি খেয়ে পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে এমন দুটি পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের নতুন বস্ত্র নিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী প্রফুল্ল রায় ঘাড়ে গভীর ক্ষত নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এখনো বেঁচে আছেন। সনাতন সরকার শরীরে বুলেটের একাধিক ক্ষত চিহ্ন নিয়ে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনও রকমে বেঁচে আছেন। নিজেদের পারিবারিক দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিন বিঘা

আন্দোলনের সৈনিক সনাতন সরকারের স্ত্রী।

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশ তাদের দুটি ছিটমহল আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামে যাওয়ার করিডোরের দাবি জানিয়ে আসছিল বহুদিন ধরেই। কিন্তু এই করিডর দিলে কুচলিবাড়ি ভারতের মূলভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তাছাড়া দেশের মাটি বাংলাদেশের ব্যবহারের জন্য কেন দেব, এই যুক্তিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৮১ সালে আঙ্গারপোতা দহগ্রামমুখী বাংলাদেশের জনগণনাকারী দলকে ভারতভূখণ্ডে ঢুকতে বাধা দেওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ১২০ জামালদহ বালাপুকুরি গ্রামের সুধীর রায়। ১৯৯২ সালের ২৫ জুন তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে হস্তান্তরের দিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন জিতেন রায় ও ক্ষিতেন অধিকারী। তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। বাম সরকারের পুলিশ নজিরবিহীন অত্যাচার চালায় দেশভক্ত প্রতিবাদী জনতার উপর।

কয়েক বছর হলো দেহ রেখেছেন শহিদ জিতেন রায়ের মাতৃদেবী ন্যাপেশ্বরী রায়। পুত্র শহিদ হওয়ার পর অসহায় অবস্থায় দিন কেটেছে ন্যাপেশ্বরী দেবীর। বেঁচে আছেন জিতেন রায়ের বোন চালকি রায়। নতুন বস্ত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় চালকি রায় বলেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমাদের সব শেষ হয়ে গিয়েছে। সুধীর রায় ও ক্ষীতেন অধিকারী দুজনেরই সহধর্মিণী বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ভালো নেই। কেমন আছেন প্রশ্ন শুনে দুজনেরই ভাষাহীন মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শরীরের ভাষায় ফুটে উঠল ওদের কণ্ঠস্বর, অনেক বার অনেক জনকে বলেছি আমাদের দুর্দশার কথা, আর কত বলব। স্বাধীন ভারতে শহিদ পরিবারের এই দুর্দশা দেখে যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় ভারী হয়ে আসবে। যাওয়া হয়েছিল তিনবিঘা আন্দোলনের আগুন ঝরানো দিনগুলিতে যিনি ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাতদিন এক করে নিষ্ঠা সহকারে খেটেছেন এখন বয়সে প্রবীণ সেই সাংবাদিক সুশান্ত গুহর বাড়িতেও। একরাশ ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে সুশান্তবাবু বলতে শুরু করলেন, বুঝলেন তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলির জন্য কেউ কিছু করলো না। সুশান্তবাবু আরও বলেন, সন্ধ্যার পরে মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা জনপদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে। ভারতের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তাহীনতা ও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দাপটের বিভিন্ন ঘটনা শুনে মনে হলো বাস্তবে এই রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছু নেই।

শান্তির খোঁজে মায়াপুর ইসকনে

শুভ্রা মল্লিক

মায়াপুর ইসকনে এলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না রাই কমলিনীর। তবে মন্দিরে এসে পেলাম এক অপার শান্তি। জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অমৃত স্বাদ। নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে কার না ইচ্ছা হয়। একদিকে এখানে যেমন আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে গঙ্গার প্রবহমান স্রোত বইছে সর্বদা। জলঙ্গি আর গঙ্গার মাঝখানে কালো জল নিমেষেই আপনার দু'চোখ জুড়িয়ে দেবে। গরমের সময় মনে হবে জলে নেমে পড়ি। সাঁতারুদের এর লোভ সামলাতে কষ্টই হবে। অন্যদিকে, যাদের নৌকাবিহার করার অভ্যাস আছে, তাঁরা এই শখ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। তাই আর দেরি নয়। মন্দিরময় মায়াপুরধাম বসন্তের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির স্পর্শে প্রাণের উচ্ছ্বাস আর রোমাঞ্চকর পরিবেশে সবান্ধবে সপরিবারে বেড়ানোর উপযুক্ত জায়গা।

শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্ত নিখাদ ভালোবাসার ভালোলাগার কেন্দ্র। দূষণমুক্ত পরিবেশে মানুষের হাতে গড়া মন্দিরময় শ্রীমায়াপুর ধামে রয়েছে ইসকন মন্দির-সহ আরও অনেক মন্দির। কলকাতা থেকে ১৩৭ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মায়াপুর ইসকন মন্দির। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনা কেন্দ্রের কথা আমরা অনেকেই কমবেশি জানি। কলকাতার এক সন্তান কৃষ্ণ প্রেমিক বৈষ্ণব অভয়চরণ দে মায়াপুর ইসকন তৈরি করেন। অভয়চরণ দে ছিলেন শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধান্ত সরস্বতীর শিষ্য। গুরুদেবের অনেক শিষ্য থাকলেও একমাত্র অভয়চরণ দে'ই সারা বিশ্বে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' হরিনাম সংকীর্তন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র শান্তির জন্য। এই মায়াপুর ইসকন মন্দিরের ১২০টি দেশে ছ'শোর বেশি শাখা রয়েছে। অথচ মাত্র আড়াই কাঠা জায়গা নিয়ে শুরু হয়েছিল মায়াপুর ইসকন মন্দিরের যাত্রা। চন্দ্রোদয় মন্দির ছাড়াও রয়েছে ১০৮ ফুট উঁচু বিশাল কারুকাজসম্পন্ন প্রভুপাদের সমাধিমন্দির যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ইসকন মন্দির চত্বর জুড়ে রয়েছে হরেক রকম ফুলের মেলা। বিশ্বের উচ্চতম মন্দিরের কাজ চলেছে দ্রুত গতিতে। রাসপূর্ণিমা থেকে শুরু করে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত দর্শকদের ঢল

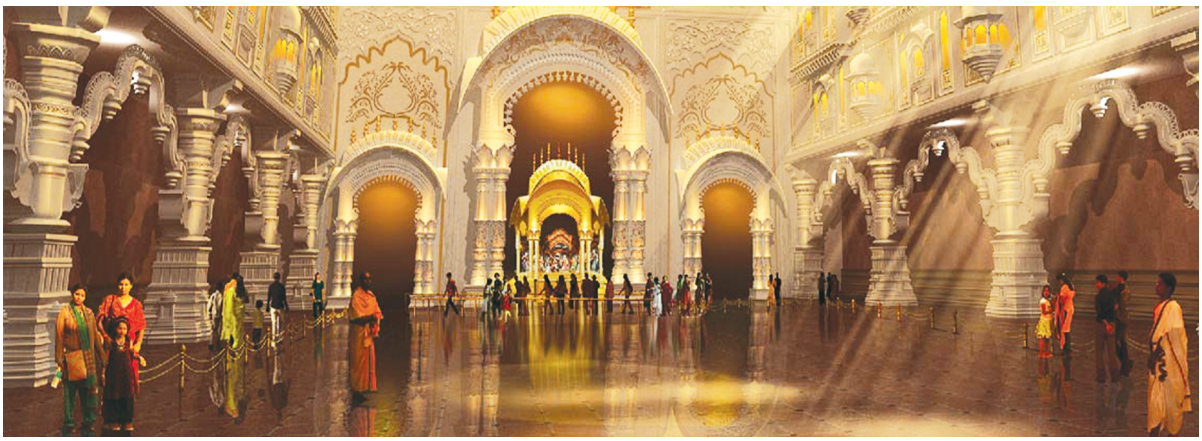

নামে এই মন্দির প্রাঙ্গণে।

রাস্তার ধারে ধারে ছায়ায় আলপনা আঁকা নদীর তীরে অসংখ্য কাশফুলে মুক্ত বাতাসে মন উদাস হয়ে যাবে এখানে এলে। সীমাহীন সবুজের সমারোহ, যা আপনাকে দিতে পারে অন্য অনুভূতি। এমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কোনও মানুষকে বেঁধে ফেলতে পারে যখন তখন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নবদ্বীপে পতিত পাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত কৃষ্ণ নাম সারা বিশ্বকে এক সূত্রে গেঁথেছে। মায়াপুর ইসকন মন্দির লাগোয়া ভাগীরথী কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে মহা সাগরের দিকে। অন্য প্রান্তে জলঙ্গী নদী তার জলরাশি নিয়ে মিশেছে এখানে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে চাঁদনী রাতে নৌকাবিহার আপনাকে দিতে পারে অনাবিল আনন্দ। মায়াপুরের সব থেকে বড় আকর্ষণ মায়াপুর ইসকন মন্দির। এক কথায় শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির। তাই মায়াপুর নবদ্বীপের প্রধান আকর্ষণ ইসকন। এখানেই রয়েছে বিশ্বের সব থেকে বড় পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিতের বিগ্রহ রয়েছে। নিখাদ অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে। ২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাধাকৃষ্ণের অষ্ট সখী ও নৃসিংহদেবের বিগ্রহ ও ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ মূর্তি। সারা বিশ্বে ভক্তি ভাবনার মানুষ ছুটে আসেন এখানে শান্তির সন্ধানে, অমৃতের সন্ধানে। তাই এক কথায় বলা যেতে পারে সবারই এখানে আসার ইচ্ছা থাকে। তাই আর দেরি নয় এখানে আসুন ও সবার মুখে উচ্চারিত হোক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। যেন এক অন্য জগতে আপনি বিরাজমান হবেন।

এখানে কী কী দেখবেন :

মায়াপুর বেড়াতে গেলে দেখতে পাবেন মায়াপুর ইসকন মন্দির। এছাড়াও চাঁদ কাজির সমাধি বামুনপুকুরে রয়েছে। রয়েছে মায়াপুরে অবস্থিত বল্লাল ঢিবি, রাজপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির, শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় সেবাশ্রম রয়েছে। রয়েছে শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীচৈতন্য ইনস্টিটিউট, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম, শ্রীশ্রী গৌড় নিত্যনন্দ মন্দির, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ। চৈতন্য ভাগবত মঠ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর ভবন, শ্রীসন্ত গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশন-সহ ছোটোখাটো মন্দির এখানে বিরাজমান।

সব মন্দিরেই রয়েছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ও চৈতন্যদেব-সহ অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ।

ইসকন মন্দিরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান কী কী :

মায়াপুর ইসকন মন্দিরের মধ্যে রয়েছে অনেক বিভাগ। প্রভুপাদের পুষ্প সমাধিমন্দির পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির বর্ণাঢ্য গম্বুজ অভ্যন্তরের জন্য বিখ্যাত।

মন্দিরের দোতলায় রয়েছে প্রভুপাদের জীবন বাণী ও কর্মকাণ্ডের ওপর এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রদর্শনী। ইসকন মন্দির ক্যাম্পাসের মধ্যে রয়েছে গুরুকুল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্ররা এখানে বৈদিক পদ্ধতিতে পড়াশোনা করতে আসেন।

গোশালা— বিভিন্ন জাতের চারশোর বেশি গোরু এখানে রয়েছে। এখানে গো সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি গোরুকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে সযত্নে লালিত পালিত করা হয়।

ভজন কুটির— ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রভুপাদ প্রথমেই এই ভজন কুটিরে থাকতেন। এখানে সারা বছর ধরে একনাগাড়ে হরিনাম সংকীর্তন চলছে বিশ্ব কল্যাণের জন্য। শ্রীশ্রী গৌর নিতাই বিগ্রহ পুজো এখানে হয়।

এছাড়াও রয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রধান মন্দির। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক ভক্ত এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন করে ও শান্তিতে থাকেন বলে কথিত। এছাড়াও রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী। রয়েছে প্রভুপাদের আবাস গৃহ। রয়েছে পুস্তক প্রকাশন বিভাগ। ইসকন মন্দিরে আরতি, সন্ধ্যারতি ও পূজার্চনা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তদের সংকীর্তন আপনাকে দেবে অনাবিল আধ্যাত্মিক আনন্দ। ▮

এই সময়

মুক্তি

খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রায় ১৫০০ কৈলাসযাত্রী আটকে পড়েছিলেন। নেপাল

সরকারের সহায়তায় বিদেশমন্ত্রক তাদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ৫০০ তীর্থযাত্রীকে হিলসা থেকে কৈলাস মানস সরোবর অঞ্চলের সিমিকোটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী উবাচ

মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আপনারা নতুন।

তাই মাথায় ভালো ভালো আইডিয়া আসবে। জানবেন, একটা ভালো আইডিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথনির্দেশ দিতে পারে। সদ্যনিযুক্ত আই এ এস অফিসারদের এক সমাবেশে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কৃষকের পাশে

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের রোজগার বাড়াতে হবে। ক্যাবিনেট কমিটি অন

ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের বৈঠকে এই স্বপ্নকে বাস্তব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ খরিফ মরশুমে কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে জানা গেছে।

সমাবেশ -সমাচার

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের মালদা জেলা সম্মেলন

গত ১ জুলাই মালদার ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০২ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের মালদা জেলার নবম সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত, সংরক্ষক অলোক কুমার দাস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ তথা সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য প্রবীর মিত্র। স্বাগত ভাষণে শ্রীমিত্র জাতীয়তাবাদী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, আদর্শ ও রাষ্ট্রীয়ত্বই হলো এই শিক্ষক সংগঠনের ভিত্তিরূপ। এরপর সংগঠনের রাজ্যসভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে তুলে ধরেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত সংগঠনের ভবিষ্যৎ

কর্মপন্থা বিষয়ে সকল শিক্ষকমণ্ডলীকে পথনির্দেশ করেন। এরপর বর্তমান পাঠ্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক ত্রুটিবিচ্যুতি ও একে সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে কীভাবে একটি সুসংহত ও সুবিন্যস্ত পাঠ্যক্রম ছাত্রসমাজের সামনে তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয় এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের একটি রূপরেখা তৈরি হয়। এটি প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়। সমাপ্তি ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরম্পরা বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্মরণাতীত কাল থেকে এই ভারতবর্ষের শিক্ষক সমাজ যে অতন্দ্র সাধনায় ব্রতী রয়েছেন সেই ঐতিহ্যবাহী দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখার জন্য শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করেন। এদিন সভায় ১৭ জনের নতুন জেলা সমিতি ঘোষিত হয়। জেলা সংরক্ষকের দায়িত্ব প্রিয়ব্রত মালাকার, জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার তালুকদার এবং জেলা সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পিত হয় মিঠুন মণ্ডলের উপর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে হালিশহরে যোগ ও রক্তদান শিবির

গত ২১ জুন বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে হালিশহর নগরে অনুষ্ঠিত হয় যোগ ও রক্তদান শিবির। সারাদিন ব্যাপী এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ড. এস এন দাস। ড. দাস প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবির উদ্বোধন করেন এবং রক্তদান ও

এই সময়

কড়া ট্রাম্প

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনওরকম যোগসূত্র প্রমাণিত হলে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন

তাকে রেয়াত করবে না। সম্প্রতি খালিল আহমেদ নামের এক ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে প্রশাসন। খলিল আহমেদ সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত।

রাজার নামে

ত্রিপুরার মানুষ অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার অযথা দেরি না করে

সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিল। এখন থেকে আগরতলা এয়ারপোর্টের নাম হবে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য কিশোর বিমান বন্দর। প্রিয় রাজাকে স্মরণীয় করে রাখার এই উদ্যোগে খুশি ত্রিপুরার মানুষ।

বেলুনে চড়ে

আন্তর্জাতিক বেলুন চ্যালেঞ্জ (২৫-২৬

জুলাই) আয়োজন করতে চলেছে রাজস্থান সরকার। সহায়তায় স্পেস কিডজ ইন্ডিয়া। উদ্দেশ্য, অল্পবয়সি মহাকাশ- প্রেমীদের স্বপ্নের আকাশে পর্যটনের সুযোগ করে দেওয়া। উল্লেখ্য, তিন দিনের একটি টেকনোলজি কার্নিভালে এই প্রতিযোগিতা হবে।

সমাবেশ -সমাচার

যোগ সম্পর্কে পথ নির্দেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ মদন বিশ্বাস, দক্ষিণবঙ্গ প্রাপ্ত কার্যকারিণীর সদস্য কাজল সিকদার প্রমুখ। বিশেষ

উল্লেখযোগ্য, বহু মা-বোনের উপস্থিতি ছিল। এই রক্তদান শিবিরে সহায়তায় এগিয়ে আসেন গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং জওহরলাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। মোট ১২০ জন রক্তদান করেন। সহভোজের পর অনুষ্ঠানের সমাপন হয়।

হিন্দি কবি গুলাব খাণ্ডেলওয়ালজীর প্রথম প্রয়াণ তিথি স্মরণ

গত ৩ জুলাই বড়বাজার শ্রীকুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে হিন্দি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি গুলাব খাণ্ডেলওয়ালের প্রথম প্রয়াণ তিথি উদ্‌যাপিত হয় পুস্তকালয়ের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির কবিতাতেই তাঁকে স্মরণ করেন পুস্তকালয়ের

অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, নবীন প্রজন্মের কবিদের প্রয়াত কবির কবিতা থেকে প্রেরণা নেওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে মহাবীর বাজাজ, সুশীলা চেনানী, মৃদুলা কোঠারী, রামেশ্বর মিশ্র অনুরোধ, গুলাব খাণ্ডেলওয়ালের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী বিভা মালানী, রাজস্থান পত্রিকার জয়পুরের সম্পাদক গোবিন্দ চতুর্বেদী প্রমুখ প্রয়াত খাণ্ডেলওয়ালাজীর ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব এবং কর্তৃত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গের স্মৃতিচারণ করেন।

এই সময়

ডিজেল চালিত

সিমলা রেলস্টেশনের কর্মীরা এখন বেজায় খুশি। কারণ হেরিটেজ মিউজিয়াম থেকে

সিমলা পর্যন্ত তাদের ডিজেল চালিত ইঞ্জিন চালাবার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের পর এই ট্র্যাকে কোনও ট্রেন চলেনি। পরিকল্পনা সফল হওয়ায় ট্রেন চালানো যাবে বলে তারা মনে করছেন।

ফাঁস

ঝাড়খন্ড পুলিশ শিশুবিক্রি ও পাচার করার অভিযোগে তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

তিনজনের মধ্যে দু'জন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী। উল্লেখ্য তাঁরা দুজনেই মাদার টেরিজা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির অধীন। এই খবরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে।

অশান্ত ইয়েমেন

ইসলামি দেশগুলিতে মানুষ নাকি সুখে শান্তিতে বাস করেন। সেই সুখ ঠিক কেমন

তার প্রমাণ দিয়েছে ইউনিসেফ। ইয়েমেনে তিন বছরের গৃহযুদ্ধে ২২০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেশির ভাগই মারা গেছে অনাহারে অপুষ্টিতে। কেউ কেউ যুদ্ধে এবং অসুখ বিসুখে।

সমাবেশ -সমাচার

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির রচিত গজল পাঠ করেন জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বংশীধর শর্মা। কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গালুরুতে স্বদেশী সঙ্ঘের উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৪ জুন কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু শহরের ভারতীয় বিদ্যাভবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৫ তম বলিদান দিবস স্বদেশী সঙ্ঘের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা, শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ

ফাউন্ডেশনের অনির্বাণ গাঙ্গুলি, কাশ্মীরি পণ্ডিত সমাজের প্রধান সুশীল পণ্ডিত, বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রবক্তা ডাঃ সম্বিৎ পাত্র, বিশিষ্ট অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহান, নিউ হরিজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল মোহন মংগনানি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিজেপি নেতা রবিকুমার প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও গণপতি বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বদেশী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সংযোজক হিমাদ্রী দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংস্থার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করেন। ইয়েদুরাপ্পা তাঁর ভাষণে শ্যামাপ্রসাদের বলিদানের উল্লেখ করে প্রদেশের রাজনৈতিক স্থিতির বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনির্বাণ গাঙ্গুলি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রত্যেক বক্তাই শ্যামাপ্রসাদের জীবনের এক এক দিক আলোচনা করেন। অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন, শ্যামাপ্রসাদের অপূর্ণ কাজ সবাইকে করতে হবে। ঘরে ঘরে শ্যামাপ্রসাদ ও ভারতমাতার ছবি রাখতে হবে। মনোজ ভারতী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর বন্দে মাতরম্ গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমজয়ন্তী উদ্‌যাপন

সম্প্রতি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই উদ্‌যাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। দেশপ্রেমী অধ্যাপক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে এই মহতী সভা আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের কাছে এক শুভঙ্করী বার্তা প্রেরণ করবে। বঙ্কিম জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নিতাই চরণ দাস, স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নাড়ুগোপাল দে, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বাংলার শিক্ষক দীপঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক মানবেন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক রঘুনাথ মণ্ডল।

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার

শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মহাতীর্থ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই অধ্যাত্ম পথের সাধক, মুনিঋষি, সাধুসন্তগণ গঙ্গার তটভূমিতে আশ্রয় নিয়ে পরম প্রাপ্তি লাভ করেছেন। অগণিত মঠ মন্দির, দেবালয়, তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে গঙ্গার উভয় তীরে। গঙ্গাতীরে যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধকৃত্য, দেবতা পূজন যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। তাই গঙ্গার পবিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে পরমাকর্ষণে সাধুসন্তগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন গঙ্গার পুণ্য তটভূমিতে। মহর্ষি কপিল দেবের সাধনার পাদপীঠ গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সাধুসন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের এক মহান তীর্থস্থান। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নদী ও সমুদ্র বিধৌত নিম্নভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম নামে পরিচিত। এখানেই ধ্যানরত কপিলদেবের হুংকারেই সগর রাজের ষাট হাজার সন্তান ভস্মীভূত হয়। সগর সন্তানগণের সন্ধানে আগত অংশুমানকে কপিলমুনি বললেন— যদি পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী এসে এদের অভিষিক্ত করেন তবেই এরা মুক্ত হতে পারবেন। অতঃপর সগররাজ, অংশুমান, দিলীপ বহু তপস্যা করেও উর্ধ্বলোক হতে গঙ্গাকে আনয়ন করতে সক্ষম হননি। অবশেষে রাজা ভগীরথ পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে আনয়ন করে কপিলদেবের আশ্রমের নিকটে সাগর তটে নিয়ে এলে মুনিবর তখন গঙ্গাদেবীর পবিত্র সলিল সিঞ্চনে ভস্মীভূত সগর সন্তানগণকে দিব্যগতি প্রদান করেন। পবিত্র গঙ্গাসলিলের স্পর্শ পেয়ে সগর সন্তানগণ মুক্ত হলেন। এই সেই শুভ্র বালুকাযুক্ত সুবিস্তৃত বেলাভূমি, নিকটে সবুজ বনানী, সীমাহীন সৌন্দর্য সম্ভারে সজ্জিত ভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম।

গঙ্গাসাগর সঙ্গম মহাতীর্থ একবার বা একদিনের জন্য নয়, গঙ্গাসাগর সঙ্গম নিত্য মহাতীর্থ। কেননা গঙ্গাসাগর মহাতীর্থের মাহাত্ম্য অপরিসীম, অনির্বচনীয় এবং অপরিমেয়। স্কন্দ পুরাণে আছে— মানব সকল তীর্থ দর্শন, দান, তপস্যা, দেবপূজা, যজ্ঞাদিতে যে ফল লাভ করেন, তা একমাত্র গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানে লাভ হয়— 'লভতে পুরুষঃ সর্ব্বং স্নাত্বা সাগর সঙ্গমে।" পদ্ম পুরাণে আছে—কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাকেই আশ্রয় করা কর্তব্য—'কলৌ গঙ্গা সমাশ্রয়েৎ।' যারা সশরীরে গঙ্গাস্নানে যেতে অসমর্থ তারাও যদি— 'গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনাং শতৈরপি। মুচ্যন্তে সর্ব্ব পাপেভ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।' অর্থাৎ কেহ যদি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শত যোজন (আটশত মাইল) দূরে বসে— 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে ডাকেন সকল প্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়ে তিনিও ভগবান বিষ্ণুর লোকে গমন করেন।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রধান আকর্ষণ শ্রীকপিল দেবের মন্দির। শ্রীমন্দিরে কপিলদেব পদ্মাসনে যোগারূঢ় অবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁর বাম হাতে কমণ্ডলু, ডান হাতে জপমালা, শিরোদেশে পঞ্চনাগ ছত্রবৎ অবস্থিত। শ্রীকপিল দেবের দক্ষিণে শ্রীগঙ্গাদেবীর বিগ্রহ। ইনি চতুর্ভুজা এবং মকর বাহন। শ্রীহস্ত সমূহে শঙ্খ, পদ্ম, অমৃতকুম্ভ ও বরাভয়। সম্মুখে মহাতাপস ভগীরথ। কপিলদেবের বিগ্রহের বামপার্শ্বে সগর রাজ ভক্তি বিনম্র চিত্তে করজোড়ে অবস্থান রত। এই গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তি দিবসে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী মহাস্নান করে থাকেন। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, গঙ্গায় তর্পণাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে ওই পুণ্য দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর স্নানের বিশেষ মন্ত্র, যথা—

"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবী সরিতাম্বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ।।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। স্নানান্তে দানাদি কার্য বিধেয়। জগৎ জীবের উদ্ধারের জন্য ত্রিলোক পাবনী গঙ্গাদেবীর এই জগতে আগমন। তাই আমরা এই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান মহোৎসবের দিনে ত্রিলোক জননী গঙ্গাদেবীর চরণ সমীপে প্রার্থনা করি— "হে মাতঃ গঙ্গে! আপনি এই ভারত ভূমিতে শুভাগমন করে যেমন সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলায় প্রাকৃতিক সম্পদে দেবী বসুন্ধরাকে সমৃদ্ধ করেছেন, ভস্মীভূত সগর সন্তানগণের পরম কল্যাণ বিধান করেছেন, তেমনি— হে শান্তি সম্পাদন কারিণী! হে প্রণতার্তিহারিণী জগন্মাতঃ! দুঃখ-ক্লেশে লাঞ্ছিত, ত্রিতাপে দগ্ধীভূত, বেদনায় আর্তনাদগ্রস্ত জীব-জগতের প্রতি আপনার তরঙ্গ থেকে আগত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করে তাদের ত্রিতাপে তাপিত হৃদয়ে সুশীতল শান্তির স্পর্শে পরমানন্দের সঞ্চার পূর্বক পরম কল্যাণ বিধান করুন। ■

ভক্তিসাধনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশক রজনীকান্ত সেন

অমিত ঘোষ দস্তিদার

জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বরং সমন্বিত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তিনটি ধারা মিলেমিশে একাকার। ভারতীয় ভক্তিসাধনার এক স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হলো গান। রজনীকান্তের কোনও গানে রয়েছে দেবতার কাছে প্রার্থনা, আবার অন্যগানে দেবতাই যেন ভক্তকে ভরে দিতে চান অযাচিত দানে।

রজনীকান্ত রাজশাহির কবি ছিলেন। কলকাতার নাগরিক জীবন তাঁর সাহিত্য জীবনের পটভূমি ছিল না। উত্তরবঙ্গের গ্রামজনপদের নিবিড় নদীপ্লাবিত পরিবেশে সীমাবদ্ধ শ্রোতার কাছেই তাঁর গান পৌঁছেছিল, বেশিরভাগই লোকমুখে, কণ্ঠবাহিত পরম্পরায়। নাগরিক জনপ্রিয়তার সুযোগ সন্ধানী পথ রজনীকান্তের জানা ছিল না।

স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রজনীকান্ত কলকাতায় তাঁর জনৈক জ্ঞাতি ব্রাহ্ম ভ্রাতার সৌজন্যে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন ও ব্রাহ্ম উপাসনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া আরও বহু ব্রহ্মসঙ্গীত যেমন তাঁর অধিগত হয়, তেমনি তাঁর দু-একটি শান্তরসের স্নিগ্ধ উপাসনার গানও ব্রহ্মসংগীতের ডালি পূর্ণ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রজনীকান্তের সখ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রশান্ত কুমার পালের রবিজীবনী থেকে জানা যায় যে, ১৯০১ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সংবর্ধিত করা হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুকগীতি গেয়েছিলেন রজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সম্ভবত সেই প্রথম যোগাযোগ। রজনীকান্ত সেনের জন্ম ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই। বয়সে রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর সাহিত্য পরিষদের উত্তর কলকাতাস্থিত ভবনের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানেও ছিলেন রজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমবেত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচিতি করান এবং তাঁকে গান গাইতে অনুরোধ করেন।

রজনীকান্তের সংগীত চর্চার বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই। রাগ-রাগিনীর খবর তিনি নিশ্চয় রাখতেন, কারণ তাঁর গানে— আলেয়া, ইমন, কালেংড়া, কাফি, কানাড়া, কেদারা, খাম্বাজ, গৌরী, ঝিঁঝিট, টোড়ি, নটনারায়ণ, নটহোগ, পিলু-পরজ, পূরবী, বাগেশ্রী, বেহাগ, বিভাস, বসন্ত, বারোয়াঁ, বসন্তবাহার, ভৈরবী, ভৈরোঁ, ভূপালী, মল্লার, মালকোষ, সিন্ধু, সিন্ধুকাফি, সুরট, সরমল্লার, সোহিনী, ললিত, কীর্তন, মনোহরশাহি, বাউল ইত্যাদি শুদ্ধ ও মিশ্র রাগের ব্যবহার আছে।

রজনীকান্তের লেখা— 'বাণী' (১৯০২, মোট কবিতা ৬৭), 'কল্যাণী' (১৯০৫, কবিতা সংখ্যা ৮৭), 'অমৃত' (১৯১০, মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন প্রকাশিত, কবিতা সংখ্যা ৪৭), 'আনন্দময়ী' (১৯১০, মৃত্যু পরবর্তী, কবিতা সংখ্যা ৩৯), 'বিশ্রাম' (১৯১০, মৃত্যু পরবর্তী, কবিতা সংখ্যা ২৪), 'অভয়া' (সঠিক তথ্য নেই, কবিতা সংখ্যা ৬৮), 'সদ্ভাবকুসুম' (১৯১৩, কবিতা সংখ্যা ৯), 'শেষ দান' (১৯২৭, কবিতা সংখ্যা ৫৪)। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ' (২০০০, ২য় মুদ্রণ ২০০৯, সাহিত্য পরিষদ)।

বাংলাগীতি-ঐতিহ্যে রজনীকান্তের স্বহস্ত-নির্মিত গীতিমাল্য কখনই ঔদাসীন্যে অবহেলিত হয়নি। তাঁর গান ভক্তিভূষিত গীতাবলীতে ঠাঁই পেয়েছে। সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবী রজনীকান্তের গানের স্বরলিপি বীণাবাদিনী, সঙ্গীত প্রকাশিকা, আনন্দ সংগীত পত্রিকায় প্রকাশ করে গেছেন। মাসিক পত্রপত্রিকায় রজনীকান্তের গানের নিয়মিত

স্বরলিপি প্রচার তাঁর গানের একটি অ-তীব্র, কিন্তু ধারাবাহিক জনপ্রিয়তারই ছবি। গ্রন্থাকারেও তাঁর একাধিক স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গানের সংকলন গ্রন্থে ও ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। রজনীকান্তের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায় দুটি খণ্ডে কবির একশো পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমির হাতে সমর্পণ করেছিলেন, সে আজ দু-দশকেরও বেশি আগে। রজনীকান্তের গানের প্রচার ও জনপ্রিয়তার পেছনে এই স্বরলিপিগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেব রায়ও বেশকিছু গানের স্বরলিপি করে গেছেন। গত চার দশকে বাংলা গানের জগতে অন্তত দশ-বারোজন প্রথম সারির শিল্পী কেবল রজনীকান্তের গানের পারদর্শী হিসাবে বিশেষ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর একটি জীবনী রচনা করেছিলেন। রজনীকান্তের কন্যা শান্তিলতা দেবী তাঁর পরিণত বয়সে পিতৃস্মৃতি রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতৃস্মৃতি রচনার নাম 'কান্ত কবি রজনীকান্ত।'

রজনীকান্তের জীবন কর্মবহুল নয়। ব্যাধিবিপত্তিতে তাঁর দেহ যৌবনেই জর্জরিত হয়েছিল। তারপর গলদেশে দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ সাত মাস চিকিৎসাধীন থাকেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শেষ মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎ ঘটে। মৃত্যুপথিকের কবি-দর্শনেচ্ছা পূর্ণ হলো— রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন ইডেন হাসপাতাল রোডের সেই কটেজে। অভিভূত রবি-ভক্ত গুরুর চরণধূলি শিরে স্থাপন করে পূত হলেন, গলদশ্রু কৃতজ্ঞতায়, মরজীবনের অন্তিম চরিতার্থতায় ধন্য হলেন। তারিখটা ছিল ১৩১৭-র ২৮ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে বলেছিলেন, 'আপনাকে পুজো করতে ইচ্ছা করে।' তাই শুনে রজনীকান্ত লজ্জায় বিনয়ে সংকোচে কবির কোলে আশ্রিত হয়েছিলেন।

ভয়ংকর অবসানবেলায় রজনীকান্তের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। সেদিন গণমাধ্যমের কোনও প্রচার ছিল না, বেতার ও অন্যান্য সংবাদ পরিবেশনেরও ব্যবস্থা ছিল না। তবু জীবনাবসানের অল্প সময়ের মধ্যে শেষ দর্শনের জন্য হাসপাতাল চত্বর ভরে উঠেছিল অশ্রুবারি সিক্ত পুষ্পমাল্যে ও অগণিত কবি ভক্তে। 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে'— কণ্ঠে কণ্ঠে এ গান গেয়ে শবযাত্রীরা রজনীকান্তের মরদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রা করেছিলেন। একজন কবির প্রয়াণে তাঁর গান গাইতে গাইতে কলকাতা শহরে শ্মশানযাত্রা, সম্ভবত, শহরের ইতিহাসে সেই প্রথম।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে এক মহিলা-সমিতি-প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে' গানটি গেয়েছিলেন। সেই সভায় রজনীকান্ত-কন্যা শান্তিলতা দেবী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায়, রজনীকান্তের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

বাংলা ভক্তিসংগীতের ইতিহাসে রজনীকান্ত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশ থেকে দেশে সংস্কৃতি তার নিজস্ব এক অভিমুখ নিয়ে চলে। সেইসব অভিমুখের একাধিক ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে তৈরি করে বিশ্বসংস্কৃতি; তার অন্যতম অংশীদার রজনীকান্ত সেন। ■

দেবদেবী ও অবতারগণের প্রতীকী তাৎপর্য

রবীন সেনগুপ্ত

মা দুর্গার দশটি হাত। মা কালীর দশমহাবিদ্যার দশ প্রকার রূপভেদ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশাবতার— এই সবই হলো এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দশ প্রকার শক্তি ও অবস্থা পরিবর্তনের বিজ্ঞান সম্মত রূপক বা প্রতীক। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য দশ প্রকারের শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন হয়। এই দশ প্রকার শক্তির নাম হলো— (১) স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, (২) উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, (৩) ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, (৪) গ্র্যাভিটি, (৫) চিৎশক্তি, (৬) দৈর্ঘ্য, (৭) প্রস্থ, (৮) বেধ, (৯) স্পেস এবং (১০) শূন্যতা।

মা কালীর গলায় ৫১টি মুণ্ডমালা হলো ৫১টি কোয়ান্টাম ফিল্ডের প্রতীক। পৃথিবী থেকে আমরা মহাকাশকে নীল দেখি। মহাকাশের পরবর্তী বর্ণ কালো। তাই শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, মা কালী প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রা দেব-দেবীর গাত্রবর্ণ নীল বা কালো রূপে দেখানো হয়।

সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিটি দেবদেবীর মূর্তি বা ভাস্কর্য, তাদের দেহের বর্ণ, হস্ত, পদ, অস্ত্র, বাহন, জিহ্বা, চক্ষু, পোশাক, গহনা, মালা, দেহের ভঙ্গিমা— এই সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। মর্ডান আর্টে যেমন প্রতীকী অর্থ থাকে, যোগ বিজ্ঞানে সিদ্ধ ঋষিগণও অনুরূপ ভাবে প্রতিমার মধ্যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন। হজরত মহম্মদ, বুদ্ধদের মহাবীর, রাজা রামমোহন— এঁরা এগুলি বুঝতেন না বলেই প্রতিমা পূজাকে অসার বলেছেন। কিন্তু মূর্তিপূজাকে বন্ধ করতে পারেননি।

মানুষ যখন যোগসিদ্ধি লাভ করে তখনই তার মহাজ্ঞান, মহৈশ্বর্য, মহা জনপ্রিয়তা ও সংগ্রাম করলে মহাশক্তি আয়ত্ত হয়। এই চারটি বিষয়ের প্রতীক রূপেই মা দুর্গার সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকের প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। মনের আসুরিক শক্তিগুলিকে দমন করেই নিজেকে মঙ্গলজনক কাজে উৎসর্গ করা যায়, তাই অসুরদলনী মা দুর্গার প্রতিমাটাও এক প্রকারের প্রতীক। সিংহ, সর্প, পেঁচা ও ময়ূর হলো গতি ও কর্মের প্রতীক। প্রকৃতি হলেন নগ্না। সেই নগ্না প্রকৃতিকে আবৃত রেখেছে গাছ, পাহাড় ইত্যাদি। প্রকৃতিরই মূর্তরূপ মা কালীও তাই নগ্নিকা। নগ্না কালীকে আবৃত করে রেখেছে মুণ্ডমালা ও অসুরদের কর্তিত হস্ত। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বাঁশি হলো নাদব্রহ্মের প্রতীক। গোপ-গোপীগণ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির প্রতীক। আর রাধা হলেন মহাশক্তির প্রতীক। শিবের হস্তে ডমরু, ত্রিশূল, গলায় সর্প, এগুলিও হলো শব্দশক্তি, ধাতুশক্তি, গরলশক্তিকে ধারণ করে রাখার প্রতীক।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

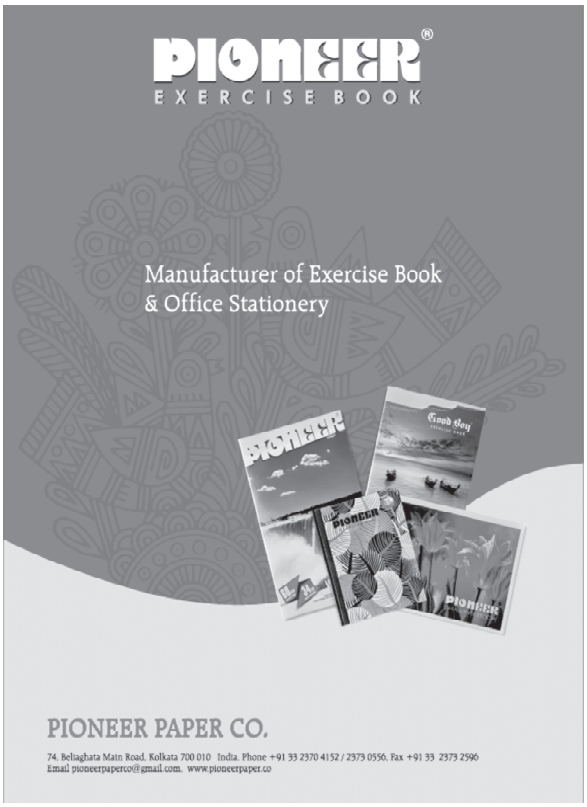

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

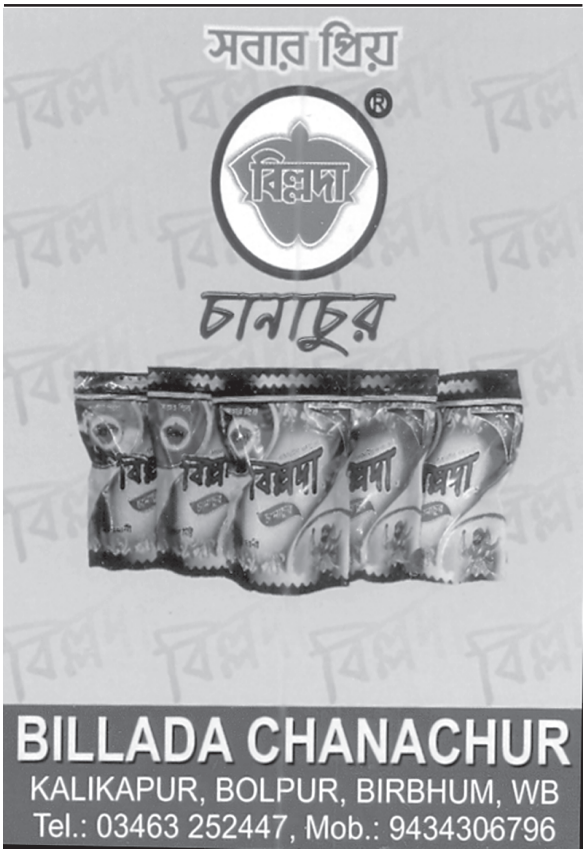

মুকুটমণিপুরের রাত

বর্ণালী রায়

আগস্ট মাসে এই বদ্ধ গরমে ঠাণ্ডা লাগছে কেন রে বাবা। কাল থেকে যা মশার কামড় খাচ্ছি নির্ঘাত জ্বর এসেছে। কলকাতায় ফিরে সোজা ডাক্তার দেখাতে না ছুটতে হয়। ওরে বাবা কী জানি ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু না চিকুনগুনিয়া।

কিন্তু লজ থেকে তো একটা মশারি দিয়েছিল কাল রাতে? ছেঁড়া ফাটা হলেও তো ছিল।

এত অন্ধকার যে কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। ধুর বাবা সবাই কেমন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমাচ্ছে। পিঠের নীচটা এত খোঁচা খোঁচা কী লাগছে রে বাবা। আচ্ছা জ্বালা হলো তো। না এবার উঠতেই হবে। আলোটা জ্বালিয়ে দেখি ব্যাপারখানা।

এ কী! আমি এ কোথায় শুয়ে আছি? ঘর কই? এটা তো কোনো ঘর নয়। আমি তো ঘরের ভিতরে শুয়ে ছিলাম, বাইরে এলাম কী করে। বাকি সবাই কই। পলাশ, নীল, অমিতা কোথায় গেল ওরা। আমার পায়ের নীচে পাতার খসখস আওয়াজ হচ্ছে যে। ধারে কাছেই কীসব যেন ডাক শুনতে পাচ্ছি। তবে কি আমি ঘুমের ঘোরে বাইরে চলে এসেছি? আমি কী করব। হা ঈশ্বর এ আমার কী হলো! কিন্তু ঈশ্বরও কি আজ শুনবেন? লাস্ট কবে ভক্তিভরে পূজা করেছিলাম মনে নেই। আমার নয় মনে নেই কিন্তু ওনার কাছে নিশ্চয় একটা হিসেব আছে।

এভাবে কতক্ষণ বসে আছি জানি না। দিনের আলো একটু একটু ফুটছে। খেয়াল করলাম পরনে একটা ট্রাকপ্যান্ট আর টি শার্ট, পা খালি। আর আমি যেখানে বসে আছি সেটা একটা জঙ্গলের মতো জায়গা। ধীরে ধীরে জায়গাটা কেমন চেনা চেনা ঠেকতে লাগল। আরে এটা তো অরুন্ধতি লজের সামনের জঙ্গলটা। নাকি আমার মনের ভুল? না তো, কিছুতেই না। এই তো সেই পাকুড় গাছটা যেটায় কাল পলাশ উঠতে গিয়ে পড়ে গেছিল, আর আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিলাম, আর তখনই নীল ফোটো তুলে নিল। তবে কি আমি ঘুমের ঘোরে হেঁটে হেঁটে এতটা চলে এলাম? আমি তো বরাবর ঘুমের ঘোরে কথা বলি জানতাম, এ আবার নতুন উপদ্রব নাকি? আমি ছুটতে লাগলাম জঙ্গলের এপাশ থেকে ওপাশ। কিন্তু না কই সেই লজ। বাকিরাই বা কোথায়?

চার বন্ধু মিলে গত পরশু এসেছিলাম মুকুটমণিপুরে দুদিনের ছুটি কাটাতে। সপ্তাহান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলো ছিল ছুটির দিন। ব্যাস বাঙালিকে ঘরে আটকে রাখে সাধ্যি কার। যাব কী যাব না করতে করতে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছিল। তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে, কোনও হোটেল, লজে তিল ধারণের জায়গাটুকু নেই। দু'একজন হোটেল মালিক তো টেলিফোনে এমন ধমকালেন যে আমার মনে হলো শতাব্দীর সেরা ভুলটা করে ফেলেছি। তা আর কী হবে মন খারাপ করে। যাওয়া বাতিল করতে হবে। এমন সময় যাবার আগের দিন সকালে ত্রাতার ভূমিকায় উপস্থিত হলো আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ। বিকাল বেলা হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন

ফঃ ৫

করে বলল, নে এ যাত্রায় উতরে দিলাম, একটা ব্যবস্থা হয়েছে। রানা বলে একটা ছেলের খোঁজ পেয়েছি, মুকুটমণিপুরে থাকে। অরুন্ধতী লজে তোদের থাকার ব্যাবস্থা করে দিয়েছে। আমি তো তখন আনন্দে আত্মহারা। রানার ফোন নাম্বারটা নিয়েই ফোন লাগালাম।

হ্যালো, রানা চক্রবর্তী বলছেন?

হ্যাঁ, বলছি।

আমি অনিরুদ্ধর বন্ধু বলছি ওই অরুন্ধতী লজে বুকিংয়ের বিষয়ে।

আরে হ্যাঁ দিদি চলে আসুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। নিশ্চিন্তে চলে আসুন।

আমরা সবাই তো গদগদ। সকাল সকাল ব্যাগ কাঁধে শালিমার স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বসলাম। গন্তব্য বাঁকুড়া।

আমি আর অমিতা বসার সিট পেলেও বাকিরা পেল না। আমাদের পাশের সহযাত্রীটি প্রায় দুজনের জায়গা নিয়ে বসেছে, আর ট্রেনে যা উঠছে তাই খাচ্ছে। সিঙ্গাড়া, কচুরি, পেয়ারা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। অমিতা বলল, হ্যাঁ রে থাকার জায়গা না হয় কোনওরকমে ম্যানেজ হয়েছে, খাওয়া দাওয়া পাব তো? এমন দু' এক পিস আরও গেলে তো জন্ডিস কেস।

যা হোক জল্পনা আর হুল্লোড়ের পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে বাঁকুড়ায় নামলাম। তখন ঘড়িতে বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা। নেমেই একটা ফোন করলাম অরুন্ধতী লজের রানাকে। ফোনটা বেজে গেল। পলাশ বলল, নিশ্চয় ব্যস্ত আছে। আমাদের আর দেরি করে কী লাভ, বরং বেরিয়ে পড়ি। পরে দেখা যাবে ফোন করে। স্টেশনের সামনে থেকেই একটা ম্যাজিক ভ্যানের সঙ্গে রফা করে পাড়ি দিলাম মুকুটমণিপুরের দিকে। ড্রাইভার বলল ৫৫ কিলোমিটার রাস্তা, ঘণ্টা দেড়েক টাইম লাগবে। শহর ছেড়ে বেরোতেই সবুজের সমারোহ। সুন্দর পাকা চওড়া হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। দু'পাশে ধানি জমি। কোথাও জঙ্গলের আভাস। বনবাসী মানুষজন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে মাথায় নিয়ে চলেছে। রাস্তাটার দু'ধারে গাছের সারি। কোথাও কোথাও দেখে মনে হচ্ছে দু'দিকের গাছ মাথা নুইয়ে যেন আমাদের জন্য প্রবেশদ্বার বানিয়ে দিয়েছে।

এসব দেখতে দেখতে রানাকে আর ফোনটা করা হলো না। এই রে কী হবে? রানার ফোন তো সুইচ অফ বলছে। আবার করলাম, কই না ত এখানো তো তাই। কৌস্তিক বলল, অতো চাপ নিস না গিয়েই দেখা যাক। সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে পৌঁছালাম মুকুটমণিপুরে। ড্যামের রাস্তা পেরিয়ে কতগুলো দোকান।

দাদা অরুন্ধতী লজটা কোথায়?

অরুন্ধতী লজ! না, এই নামে তো এখানে কোনও লজ নেই।

অ্যাঁ, সেকি! নেই? ভালো করে ভাবুন না দাদা।

আরে ভাবা তো কিছু নেই আমরা তো এখানকারই লোক। আর আছে তো হাতে গোনা দুটো সরকারি আর পাঁচ ছটা প্রাইভেট।

আমাদের তো মাথায় হাত। এদিকে রানার ফোন এখনো অফ। অনিরুদ্ধকে ফোন করে সব জানালাম। মিনিট পনেরো বাদে শুকনো গলায় ফোন করে বলল, কিছুতেই কিছু হলো না। বুঝলাম এই আশা ছেড়ে আমাদেরই কোনও উপায় বার করতে হবে। থাকার জায়গা খুঁজতে বেরলাম। আধা ঘণ্টার মধ্যে পুরো মুকুটমণিপুর চষে ফেললাম হোটেলের জন্য। কিন্তু সব জায়গাতে একই উত্তর, না।

মনে হচ্ছে ফিরেই যেতে হবে। আমাদের শেষ ভরসা মোনালিসা লজ। আমরা গিয়ে ম্যানেজারকে ধরলাম। এর মাঝেই অমিতা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। আর ম্যানেজার পড়লেন ফেসাদে।

আচ্ছা, দাঁড়ান দেখছি। এক ভদ্রলোক চারটে রুম নিয়েছিলেন। বলছিলেন একটা হয়তো ছেড়ে দেবেন। দেখি উনি কী বলেন।

উনি কোথায় আছেন ম্যানেজার বাবু?

খাচ্ছেন, ডাইনিং হলে,

আমাদের চোখের আড়ালে নীল কখন হাওয়া হয়ে গেছে। মিনিট দশ বাদে দেখি একটা নাদুস নুদুস লোকের সঙ্গে হাসতে হাসতে আসছে। আরে কী সর্বনাশ! এটা তো সেই আমাদের ট্রেনের সহযাত্রী। পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল।

যাক সে যাত্রায় আর ফেরত আসতে হলো না। ঘর তো পেলাম। এবার শুরু হলো অন্য বিড়ম্বনা। এটা সম্ভবত একটা রান্নাঘর ছিল। হাল হকিকত দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। সে যাহোক মাথার উপর ছাদ আছে এই যথেষ্ট। কিন্তু ডবল বেড খাটে চারটে বড় মানুষ আঁটা কীভাবে সম্ভব? পলাশ বলল যা হোক করে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে কাল ভালো রুম দেবে বলেছে। অগ্যতা ঠিক হলো আজ রাতটা কোনও রকমে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেবো।

এতক্ষণের ঝড় বয়ে যাওয়ার পর ডিম ভাত দিয়ে দুপুরের খাওয়াটা সেরে ঘুরতে বেরলাম। লজ থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেক ড্যামের ধার। লকগেট পেরিয়ে কংসাবতী ভবনের পাশ দিয়ে সুন্দর চওড়া, দু'পাশে গাছগাছালিতে ঘেরা পাকা পিচ রাস্তা চলে যাচ্ছে বাঁধের মুখে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা দুটি মূলত লাল মাটির দেশ। রুক্ষতা এ মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। চারিধার ছোট ছোট টিলা পাহাড়ে ঘেরা। এখানকার পাহাড়ের ভৌগোলিক গঠন একটু আলাদা। দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে যেন কেউ ছেনি হাতুড়ি ঠুকে ছিলা কেটে দিয়েছে। পাহাড়ের বুক চিরে লাল লাল পাঁজর। কংসাবতী আর কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে এই বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম, ওই দাদুই বলছিলেন, কাঁসাই নদী বর্ষাকালে ভাসিয়ে দিত আশেপাশের এলাকা। এই বাঁধ দেওয়াতে দুটো কাজ হয়েছে। বন্যা কমেছে আর চাষবাসেরও সুরাহা হয়েছে। বিশাল বড় এই বাঁধ। সরকারি বোর্ডে দেওয়া তথ্যে দেখলাম প্রায় বারো কিলোমিটার লম্বা, আর প্রায় আটত্রিশ মিটার উঁচু। আর একটা জিনিস জানতে পেরে বেশ ভালো লাগল, এটা নাকি এশিয়ার বৃহত্তম আর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনেকটা চলে এসেছি। যতদূর চোখ যায় নীল জলরাশি। বোর্ডে লেখা দেখলাম প্রায় ছিয়াশি বর্গকিলোমিটার এর বিস্তার। বাঁধের একদিকে সবুজ ছায়া ঘেরা গ্রাম, আর অন্যদিকে অনন্ত জলরাশি। টেরই পাইনি কখন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাঁধের জলে অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলাটা ভাষাতীত। কখনো হলুদ, কখনো সোনালি, কখনো আবার ধূসর বিষাদ মাখা। পাখিদেরও ফেরার সময় হয়ে এসেছে। আমরাও লজের পথে এগোলাম।

সন্ধ্যের পর থেকে আড্ডা জমে ওঠে বেশ কয়েক কাপ চায়ের সঙ্গে। কারেন্ট চলে গেল হঠাৎ। নীল বলল, এবার আড্ডা জমে উঠবে। আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েই বলতে লাগল আমার মনে হয়, রানা আসলে একটা অতিমানবীয় ঘটনা।

আমি বললাম, মানে?

বুঝলে না নিশির ডাক ছিল। আমাদের ট্রাপ করে নিয়ে আসার।

এমন হয়, তুমি জানো না। আমার মামার বাড়ির গ্রামে এমন নিশি ডাকের অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে।

আমি বললাম, পাগল নাকি, রানা তো অনিরুদ্ধর চেনা ছেলে।

হতেই পারে না তুমি অনিকে ফোন লাগাও, দেখ ও কী বলে।

আমিও বাজি লড়ে ফোন লাগালাম অনিকে।

হ্যালো, অনি? আচ্ছা একটা কথা বল তো, এই রানা ছেলেটাকে তুই কত দিন চিনিস।

না না আমি তো সেভাবে চিনিই না। সেদিন ট্রেনে ছিলাম তুমি ফোন করে বললে মুকুটমণিমুরে থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমি তখন এদিক সেদিক আমার চেনা লোকজনকে ফোন করলাম। কিন্তু কেউই পজেটিভ কিছু বলল না, আমি সবে ভাবছি তোমায় জানাবো যে কিছু হলো না। হঠাৎ এই ছেলেটা মার পাশে বসেছিল, বলল, দাদা ঘর পাচ্ছেন না মুকুটমণিপুরে, আমি সাহায্য করতে পারি। প্রথমে অবাক হলেও, ছেলেটার কথাবার্তা বেশ ভালো লাগল। তোমাকে রেকমেন্ড করলাম।

কথা শুনে তো আমি অবাক! ফোনটা স্পিকারে ছিল তাই সব কথা সবাই শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে নীল বলল, বলেছিলাম নিশির হাতছানি।

সেদিন রাতে বেশি দেরি না করে শুয়ে পড়লাম যে যেমন খুশি। এত ক্লান্ত ছিলাম যে অঘোরে ঘুমালাম, তেমন প্রবলেম হলো না।

পরদিন ভোর ভোর উঠেই বেরিয়ে পড়লাম। শুরু হলো কুমারী আর কংসাবতীর বুকে নৌকা নিয়ে ঘোরা ফেরা। নীল জলের উপর নতুন সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। দূরের টিলা পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝি দাদা বললেন, শীতে নাকি টুরিস্ট পার্টির সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখির দল। মুকুটমণিপুরের দিক থেকে নৌকা নিয়ে আমরা ড্যামের ওপাশে বনপুকুরিয়া নামে একটা ছোট বনবাসী গ্রামে গেলাম। এখানে একটা মৃগদাব আছে। পাড়ে নেমে মোরামের রাস্তা ধরে জঙ্গলের পথে এগোতে লাগলাম। গোরুর পাল নিয়ে রাখালের দল চলেছে, নিরালা গ্রামের মাটির বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর হলুদ ফুলের কার্পেট বিছানো। বিচিত্র সব শিংওয়ালা হরিণের দেখা পেলাম। বনপুকুরিয়ার এদিকটা দিয়ে নাকি পুরুলিয়ার মানবাজারের কাছাকাছি পড়ে। নদীতে মানুষের দৈনন্দিন পারাপারের ব্যবস্থা বলতে মাঝি নৌকা। আর তাতেই সাইকেল, বাইক, মালপত্র নিয়ে চলছে নিত্য জীবনযাপন।

বেশ কিছুটা সময় পার করে আবার এপাড়ে ফিরে এলাম। নদীর পাড়ে বসে চা খেতে খেতে নীল আবার শুরু করল, রানার অতৃপ্ত আত্মার গাজাখুরি গল্প।

বলে কিনা, মাঝি নাকি ওকে বলেছে রাতের দিকে বাইরে বেশি না বেড়াতে। আমরা বললাম, কেন কেন?

এবার নীল গুছিয়ে শুরু করল। মাঝি ভাই ওকে বলেছে আগে তো এখানে বেশি লজ, হোটেল ছিল না। হাতে গোনা সরকারি কয়েকটা গেস্ট হাউস। একটা লোক নাকি বহুদিন আগে বাইরে থেকে এসে লজের ব্যবসা শুরু করেছিল। কিন্তু সে সেই হোটেলের আড়ালে খারাপ কাজ করত। একদিন গ্রামের লোকেরা সেটা জানতে পেরে ওর হোটেলটা পুড়িয়ে দেয়, আর ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। সেই থেকে ওই লোকটা নাকি অমাবস্যার রাতে হানা দেয় এই মুকুটমণিপুরে। টুরিস্টদের উপদ্রব করে। নিজের লজে নিয়ে যেতে চায়।

পলাশ বলে উঠল যতসব বোগাস। মাঝি লোকটা বলছে, না কি তুই গল্প ফাঁদছিস?

আমি আর অমিতাও পাত্তা দিলাম না। নীলকে আমরা চিনি। গল্পের গোরুকে গাছে ওঠাতে ওস্তাদ ও।

সেদিন বিকেলটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম বাঁধের পাকা রাস্তা ধরে। চওড়া পিচ রাস্তা, দু'পাশে বসার জন্য চওড়া বোল্ডার ফেলা। সারি সারি লাইটপোস্ট। কাছেই পার্কের মতো একটা জায়গা একটু উঁচু। পাথরের মূর্তি আছে গণেশ, নারায়ণ। বুঝলাম পূজা হয় নিত্য। ওখানে পাথরের টিলার উপর থেকে পুরো ড্যামটা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে নীল জল আর চারপাশ সবুজ জঙ্গল আর ধুসর পাহাড়ে ঘেরা।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে লজে চলে এলাম। আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে হবে, কাল সকাল সকাল বেরোতে হবে। বাড়ি ফেরার জন্য। দশটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছিলাম।

কিন্তু এই জঙ্গলে এলাম কী করে। কালো অন্ধকার কেটে গিয়ে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে। আমি পাকুড় গাছটার পাশে ঘাপটি মেরে বসে আছি। আশ্চর্য কোথাও কেউ নেই। কিন্তু দূরে ওটা কী? মনে হচ্ছে একটা বাড়ি। বুকের মাঝে অনেক কষ্টে বল এনে, বাড়িটার দিকে গুটিগুটি এগোচ্ছি, একটু কাছে যেতেই চক্ষু ছানাবড়া! 'অরুন্ধতী লজ'-এর বোর্ড ঝুলছে বাইরে। প্রথমটা ভাবলাম মনের ভুল। না। দিব্যি গোটাগোটা হরফে লেখা। যেই সিঁড়িতে পা দিতে যাব, কে যেন ডেকে উঠল, 'দিদি চিনতে পারছেন আমি রানা'।

ওরে বাবা বাঁচাও বাঁচাও ভূত ভূত। রানা আমাকে মেরে ফেলল। চোখ বুজে প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি।

হঠাৎ এক বালতি জল যেন গায়ে পড়ল। চোখ খুলে দেখি আমি মাটিতে শুয়ে আছি। নীল, পলাশ আর অমিতা গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমায় দেখছে। নীলের হাতে জলের বালতি।

অনেকক্ষণ ধরে তোর ক্ষেপামি, বকবকানি সহ্য করেছি। সারারাত কথা বলে বলে জ্বালিয়েছিস। এখন আবার সকাল সকাল ভূত ভূত করে চেঁচাচ্ছিস। ভেবেছিসটা কী। ওদের বকাবকির ঠেলায় আমি খানিকক্ষণ ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইলাম। তারপর বুঝলাম হে হে। পুরোটা স্বপ্ন ছিল।

যা হোক আনন্দ, মজার দুটো দিন ফুল প্যাকেজ কাটিয়ে ফেরার পালা। গাড়ি এসে গেছে। আমরা রেডি। এমন সময় খোঁজ পড়ল আমার লাল টুপিটার। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল না। ওটা আমার সব সময়ের সঙ্গী ছিল। যা হোক মনমরা হয়ে গাড়িতে উঠতে যাব, তক্ষণই রাঁধুনি ছেলেটা ছুটে এল।

ও দিদিভাই এটা আপনার? ওর হাতে আমার লাল টুপিটা। আমি তো আনন্দে ডগমগ।

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। পেলে কোথায়?

রান্না ঘরের পিছনের জঙ্গলটায় কাঠ আনতে গিয়ে দেখি পাকুড় গাছের ডালে ঝুলছিল। আমি ভাবলাম কার না কার? নিজেই পড়ে বসেছিলাম। ম্যানেজারবাবু দেখে বললেন, আপনার লাল টুপি হারিয়েছে। তাই দিতে এলাম। এটা কি আপনার?

ওর কথায় আমরা অবাক। পাকুড় গাছের ডালে আমার টুপিটা কী করে গেল? তবে কি? সত্যি?

কথা বলার মতো অবস্থা নেই। টুপিটা নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলল নীল। ■

প্লাস্টিক হটাও পরিবেশ বাঁচাও

প্লাস্টিক কৃত্রিমভাবে তৈরি এক রাসায়নিক পদার্থ। প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকজাত বস্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য করে ফেলেছি। জলের বোতল থেকে চায়ের কাপ, খাবারের থালা-বাটি-চামচ, বাজার

থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসা সব কিছুতেই প্লাস্টিক। একবার ব্যবহার করার পরেই আমরা সেগুলো যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছি। এভাবে সারা বিশ্বে প্রতি বছর তিনশো কোটি টন প্লাস্টিক পরিবেশে জমা হচ্ছে। ভারতে এরকম প্রতিদিন জমা হচ্ছে ১৫০০০ টন প্লাস্টিক। এর জৈব পচনশীলতা নেই। মাটি কোনওভাবেই প্লাস্টিকের রাসায়নিক উপাদান ভাঙতে পারে না।

এই লাগামছাড়া প্লাস্টিক ব্যবহার শুধু জনজীবনে নয়, জন্তুজানোয়ার, জল, বায়ু, মাটি, সমুদ্র সর্বস্তরে মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলছে। মানুষের ব্যবহার করা প্লাস্টিকে ছোটো বড়ো সব শহরের জল নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে বর্ষাকালে জনজীবনে দুর্ভোগ ডেকে আনছে। মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। জন্তুজানোয়ার, সামুদ্রিক প্রাণী মানুষের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক খেয়ে মারা যাচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য ব্যাহত হচ্ছে।

গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্লাস্টিক ক্যানসারের অন্যতম কারণ। চা বা অন্যান্য গরম খাবার প্লাস্টিকের কাপ বা থালায় খাবার সময় দ্রবীভূত হয়ে কিছু অংশ আমাদের পেটে যাচ্ছে। আমরা রোজই খাবারের সঙ্গে অজান্তেই প্লাস্টিক খেয়ে ফেলছি। এমনকী পানীয় জলের মাধ্যমেও শরীরে ঢুকছে প্লাস্টিক। নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বাতাসেও প্লাস্টিক কণার সন্ধান পেয়েছেন। বিবিসির বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিভাগের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর ১১টি নামি কোম্পানির জলের বোতলে প্লাস্টিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই প্লাস্টিক বোতলের জল পান করা মোটেই নিরাপদ নয়।

তাই এহেন প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য আমাদেরই অর্থাৎ ছোটোদের কিছু না কিছু করতে হবে। (১) দৈনন্দিন ব্যবহারে প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে। (২) একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয় এমন প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ও জলের বোতল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। (৩) বাজারের জন্য প্লাস্টিকের বদলে কাপড়, মোটা কাগজ ও পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। (৪) বাজারে পাড়ার জেঠু- কাকুদের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। (৫) প্লাস্টিকের থালা-বাটি-গেলাস ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। (৬) প্লাস্টিকের পাত্রে গরম কিছু খাওয়া নৈব নৈব চ। (৭) প্লাস্টিকের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। (৮)কোনওভাবে প্লাস্টিক আগুনে পোড়ানো চলবে না। কারণ এর ফলে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। রিসাইক্লিং কোম্পানিকেই দিয়ে দিতে হবে। (৯) স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্লাস্টিকের কুপ্রভাব সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। যাতে তারা সচেতন হতে পারে। (১০) প্লাস্টিক যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে এমন করতে হবে যা সহজেই রিসাইক্লিং করা যায়।

একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, সারা বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষ জলের বোতল বিক্রি হয়। এর মধ্যে অর্ধেকেরও কম রিসাইক্লিংয়ের জন্য সংগৃহীত হয়। মাত্র ৭ শতাংশ নতুন বোতল হয়ে ফিরে আসে। গবেষকদের দাবি, খুব শীঘ্রই প্লাস্টিকজনিত দূষণ পৃথিবীতে ভয়াবহ রূপ নেবে। তাই নিজেরা এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে।

সৌরভ সিংহ

ভারতের পথে পথে

বালেশ্বর

ওড়িশা রাজ্যের বালেশ্বর হলো শিশু ভগবনের প্রিয়ভূমি। ১৯১৫ সালে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এখানেই জার্মানির অস্ত্রের অপেক্ষায় চারজন সঙ্গী নিয়ে বসেছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন। কুখ্যাত চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বুড়িবালামের তীরে চষাখণ্ডে অসম যুদ্ধে নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ, চিত্তপ্রিয় ও যতীন্দ্রনাথের বুকের রক্তে মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল। আহত যতীন্দ্রনাথ শহিদ হন হাসপাতালে। তাঁর শেষকৃত্য হয় জেলখানায়। ১৯৭৯ সালে জেলের সামনে দাহস্থলে স্মারকবেদি তৈরি হয়েছে। তাঁর বন্দিবাসের সেলটি জনসাধারণের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আর সেদিনের হাসপাতালটি বর্তমানে বারবাটি গার্লস স্কুল। তাছাড়া এখানে রয়েছে বৈষ্ণবতীর্থ ওড়িশার বৃন্দাবন রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির। মন্দিরটি ১৫০ বছরের প্রাচীন।

জানো কি?

- ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিকত্ব পুরস্কার হলো ভারতরত্ন।
- সাহিত্যকর্মের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয়।
- আশাপূর্ণা দেবী প্রথম মহিলা যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।
- প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের জন্য তিনি এই পুরস্কার পান।
- দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়া হয় খেলার কোচেদের জন্য।।
- ঝুম্পা লাহিড়ী প্রথম মহিলা যিনি পুলিৎজার পুরস্কার পান।
- সিনেমা জগতের ক্ষেত্রে অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভালো কথা

আমার অসম ভ্রমণ

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা,মা মামা, দিদি ও আমি অসম রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা মা কামাখ্যা দর্শন করলাম। সেখান থেকে নেমে বালাজী মন্দির। এই মন্দিরের দেব-দেবী দক্ষিণ ভারতের দেব-দেবীর মতো। তারপর বশিষ্ঠ মুনির মন্দির। এরপর ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে উমানন্দ মন্দির দেখলাম। তারপর দিন মেঘালয়ের শিলং। এখানে মেঘ আমাদের গা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। তারপর সাতবোন জলপ্রপাত, বাংলাদেশ বর্ডার, লিভিং রুট ব্রিজ, শিলং ভিউ পয়েন্ট দেখলাম। এই ভ্রমণ আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিতিক্ষা দাস, একাদশ শ্রেণী, চাঁচোল, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ধা ক র হ বা	(১) প ন ব স ন ক্তা মু
(২) ধা ই না না ই	(২) ন স না ত্তা মো শ্চি প

২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) গোধূলিলগ্ন (২) ঘনবসতি

২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) জনসমাগম (২) তারকাশোভিত

উত্তরদাতার নাম

(১) আকাশ বাসফোড়, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) রূপষা দেবনাথ। নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৩) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৪) শ্রেয়া সাহা, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্য গত ৪ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। ২০০১ সালে তিনি সেবিকা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ২০০৭ সালে প্রচারিকার ব্রত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ৩ জুন তিনি তাঁর মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধের সমস্ত কাজ নিজে পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার আমডাঙা শাখার স্বয়ংসেবক অনিল মাহাত গত ৩ জুলাই পথদুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি সহধর্মিণী, ২ ভাই, ২ কন্যা,১ পুত্র এবং অসংখ্য স্বয়ংসেবক, গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। আবাল্য স্বয়ংসেবক অনিলদা খাতড়া মহকুমা কার্যবাহ, মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ, ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার গোসেবা প্রমুখ প্রভৃতি নানা দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। মৃত্যুর পূর্বাবধি তিনি খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেদিন সন্ধ্যায় শিশুমন্দির থেকে বাড়ি ফিরার পথে সাহেববাঁধ মোড়ে কলকাতাগামী বাস তাঁকে পিষ্ট করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। পরদিন গ্রামের আশ্রম শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এলাকায় সৎ এবং জনপ্রিয় হিসেবে পরিচিত অনিলদার মরদেহে শ্রদ্ধা জানাতে কয়েক হাজার মানুষ শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।
এলাকায় তিনি হিন্দু জাগরণের মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শত কাজের মধ্যেও স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

* * *

মালদা শহরের নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য তথা হবিবপুর খণ্ডের কেন্দপুকুর শাখার স্বয়ংসেবক ভীমচন্দ্র মাহাতর মাতৃদেবী বিলাসী মাহাত গত ১১ জুন বদরইল গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা পূর্বতন মহকুমা কার্যবাহ সত্যগোপাল ধুয়ার সহধর্মিণী কাঞ্চনবালা ধুয়া গত ১৩ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা ঠাকুরপুকুর শাখার স্বয়ংসেবক তরুণাভ দত্তের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ দত্ত গত ১ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্ত্র, ২ পুত্র ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ প্রচারক রজত রায়ের মাতৃদেবী তারাশঙ্করী দেবী গত ৫ জুলাই বাঁকুড়া জেলার মাণ্ডি গ্রামে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁরই প্রেরণায় তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রজত রায় প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার চাঁচল বিবেকানন্দ সায়ম্ শাখার স্বয়ংসেবক সৌম্যদীপ রাম গত ১ জুলাই পরলোকগমন করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৫ বছর। সৌম্য দশমশ্রেণীর ছাত্র ছিল। স্থানীয় বিবেকানন্দ মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তার অকালমৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

* * *

কালনার প্রয়াত স্বয়ংসেবক নিতাই চন্দ্র দাসের সহধর্মিণী সন্ধ্যা দাস গত ৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

তরুণ গোস্বামীর সুরেলা শিসধ্বনি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে গড়িয়াহাটের দিকে যেতে 'হেমেন' নামে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের যে দোকানটি আছে সেখানে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খান তাঁদের সাফল্যের শীর্ষ সময়ে প্রায়শই যেতেন, যন্ত্রের ঝঙ্কারের ভারসাম্য পরীক্ষা করতে। এই যন্ত্রের বিন্দুমাত্র গোলমালে তাঁদের বাজনায় যাতে হেরফের না হয়ে যায় তা নিয়ে তাঁরা স্বভাবতই যত্নবান থাকতেন। সারা ভারতে ৯০ মিনিট একাদিক্রমে শিসধ্বনি করে গান শোনাবার লোক মাত্র দু'জন রয়েছেন। সম্প্রতি 'বৈতানিকের' আয়োজনে শিসধ্বনি করে গানের অনুষ্ঠানে শিল্পী তরুণ গোস্বামীর (অন্যজন মুম্বইয়ের মহেশ কুলকার্নি) কাছে এ তথ্য পাওয়া গেল। পথের বাউলেরও তাল মেলাতে একটা একতারা থাকে। তরুণবাবুর যন্ত্র কিন্তু তাঁর ফুসফুস ও আলজিভ। এই দুইয়ের কঠিন নিয়ন্ত্রণে শিল্পী তাঁর গান পরিবেশন করেন। যাকে তরুণবাবু 'ক্রিয়াযোগেরই' একটি অঙ্গ বলে শ্রোতাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিসের প্রতি যে টান তাই তরুণ বয়েসে তাঁকে এই বিরল ধারাটি বেছে নিতে উজ্জীবিত করেছে। এদিন পুরনো দিনের মন কেমন করা সব বাংলা গানগুলিকে একের পর এক নিপুণভাবে তিনি তুলে ধরেন। শিল্পী বিগত ১৭/১৮ বছর ধরে এই শিসধ্বনির ওপর নিরন্তর অনুশীলন ও গবেষণা করে চলেছেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে দম নিতে তিনি এই সংক্রান্ত নানা মজাদার তথ্য শ্রোতাকে বাড়তি উপহার দেন। যেমন তিনি জানালেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ কিশোর বয়সে চমৎকার শিস দিয়ে গান গাইতে পারতেন।

প্রসঙ্গত, তরুণবাবু বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে যুক্ত একজন বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞও বটে। এদিনের সংগীত সন্ধ্যাটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি পবিত্র মিত্রের লেখা শ্যামল মিত্রের অবিস্মরণীয় 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা' গানটি গেয়ে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক আবহটি ধরে দেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে কী সার্থকভাবে শিসে প্রয়োগ করা যায় তার প্রমাণ হিসেবে তিনি গৃহদাহ চলচ্চিত্রে প্রদীপকুমারের ঠোঁটে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

এরপর চলতে থাকে একের পর এক হারানো রত্নের পুনরুদ্ধারের মতো বাংলা গানের অনাবিল স্রোত। বাংলা চলচ্চিত্রে রোমান্টিক গানে ইতিহাস সৃষ্টি করা শঙ্খবেলা ছায়াছবির 'কে প্রথম কাছে এসেছি' বা অবিস্মরণীয় 'এই পথ যদি না শেষ হয়' এর মতো গান যা সমকালীন ও পরবর্তী বহু যুগের বাঙালির সাংগীতিক স্মৃতিকোষে আজও সুরক্ষিত। শিল্পীর গান এই ঝরনা ধারার মুখ খুলে দেয়। উঠে আসে সলিল চৌধুরীর হেমন্ত কণ্ঠে 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' বা তরুণবাবুর কথায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স অফিসে লেখা সলিলেরই দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লবিনী গো সঞ্চারিণী'। ষাটের দশকের পুজো উথালপাথাল করে দেওয়া 'নাম রেখেছি বনলতার' শ্যামল মিত্রের উত্তাল রোমান্টিকতার ইন্দ্রজাল সংগীতপ্রেমীরা আঠারো আনা উপভোগ করেন। 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়' ছোট বোন হসপিটাল ছবির সুচিত্রা সেনের লিপে। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বন্ধনে জড়ালে' এর পিঠোপিঠি উপস্থাপনার মাধুর্যে তরুণ বাস্তবিকই এক মুগ্ধতার মায়াজালে শ্রোতৃবৃন্দকে জড়িয়ে দেন। হেমন্ত মুখার্জিকে যে গান বাধ্যতামূলকভাবে সব অনুষ্ঠানের শেষে গাইতেই হতো সেই বাঙালি স্মৃতিমেদুরতার সিগনেচার টিউন 'এই রাত তোমার আমার' রবীন্দ্রনাথের নাতি সৌমেন্দ্র ঠাকুরের প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিময় করে তোলে।

তবে, শিসধ্বনি যে আজও দেশবাসীর কাছে সেইভাবে মর্যাদা পেল না তা নিয়ে শিল্পী আপশোস জানাতে দ্বিধা করেননি। অথচ গড়পড়তা সব মানুষই মন চনমনে থাকলে একটু শিস দিয়ে ওঠেন। কঠিন অনুশীলনে নোটেশন ধরে শিস দেওয়া গানের চর্চার প্রচার ও প্রসার বাড়লে এই শিল্প সমৃদ্ধ হবে। এদিন সহযোগিতায় কিবোর্ডে সুরজিৎ, ম্যান্ডোলিনে নীলোৎপল ও তবলায় ছিলেন দীনেশ। ■

দিনমজুরের সৌজন্যে মাথার ওপর ছাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রবীণরা বলেন মানুষের সঙ্কট দূর করতে ঈশ্বর সবসময় নিজে আসেন না, কাউকে পাঠিয়ে দেন। সেই দেবদূতের হাত ধরে মানুষ সঙ্কট পেরিয়ে এগিয়ে যায় সুসময়ের দিকে।

পুরুলিয়ার বিন্দুইডি গ্রামের মানুষ ঝুকা বাউরির মধ্যে এখন সেই দেবদূতকে দেখতে পান। বস্তুত ঝুকা যা করেছেন, সমুদ্রের মতো বিশাল মন না হলে তা করা যায় না। পেশায় ঝুকা সামান্য দিনমজুর। দিনের শেষে রোজগার মাত্র দু'শো টাকা। তাও রোজ জোটে না। এই অবস্থায় স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে নিয়ে গড়া ছোট্ট সংসারের প্রয়োজন পূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ভাগ্য ভালো যে ঘরটিতে থাকেন সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ভাড়া গুনতে হয় না। ঘরের লাগোয়া একখানি জমিও আছে। অভাবী গৃহস্থ যেভাবে ভাবেন ঝুকার ভাবনাচিন্তাও এতকাল ছিল সেরকম। অর্থাৎ ছেলেরা বড়ো হবার পর যদি তারা চায় জমিতে চাষবাস করতে পারে কিংবা বিক্রি করে অন্য কিছু। কিন্তু একটা ঘটনা তার চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি জমিটি একটি স্কুলকে দান করলেন। স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা নব্বই জন। তবে ছাত্রসংখ্যা দেখে নয়, জমি দান করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন সম্পূর্ণ মানবিক কারণে।

ঝুকার মুখেই শোনা যাক, 'ছোটো স্কুল, ভেতরে জায়গা নেই। তাই ছেলেরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তাদের মিড ডে মিল খায়। গরমের সময় প্রচণ্ড রোদ্দুরে ওদের খুবই কষ্ট হয়। আবার বর্ষার সময় যেভাবে ওরা বৃষ্টির হাত থেকে খাবারটুকু বাঁচাতে যা-হোক একটা ছাউনি খোঁজে এবং ছোটাছুটি করতে গিয়ে অধিকাংশ খাবার মাটিতে পড়ে যায়, দেখে খারাপ লাগে। তাই ভাবলাম জমিটা দিয়েই দিই। 'আমার জমিটা স্কুলের একেবারে লাগোয়া। ওটা পেলে ছেলেদের খুব সুবিধে হবে।'

ঝুকা চান ওই জমিতে একটা ছাউনি তৈরি করা হোক। যার নীচে বসে স্কুলের ছাত্ররা তাদের মিড ডে মিল খেতে পারবে। গরমে তাদের কষ্ট হবে না। হঠাৎ বৃষ্টি নামলেও ছুটে কোথাও পালাতে হবে না। নিঃসন্দেহে ঝুকা বড়ো মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মহত্ত্বের পরিধি আরও চওড়া হয় কয়েকটি তথ্যে একবার চোখ বোলালে। তাঁর জমিটি ৬ ডেসিমেল আয়তনের। এখনকার সরকারি বাজারদর

অন্য রকম

অনুযায়ী ৩ ডেসিমেলের একটি প্লটের দাম ২২,০০০ টাকা। অর্থাৎ ঝুকাবাবুর জমির দাম এই মুহূর্তে ১ লক্ষ টাকারও বেশি। টাকাটা থাকলে ১৬ মাস সংসার চালাবার মতো রসদ ঝুকা পেয়ে যেতেন। এরপর আছে ছেলেদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। চাষবাস অথবা জমি বিক্রি করে অন্য কিছু। কিন্তু ঝুকা এসব ভাবতে রাজি নন। তাঁর কাছে বিবেকের থেকে দামি কিছুই নয়। তিনি নিজের সন্তানদের আগে স্কুলের ছেলেদের কথা ভাবতে চান। গ্রামের স্কুল ১ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কিনতে পারবে না, তাই তিনি জমি দান করেছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ জমিতে ছাউনি বানিয়ে দিলেই তিনি খুশি।

স্কুলের প্রধানশিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'ঝুকাবাবুর ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না। আমরা একটা ছাউনি তৈরি করব। অবশিষ্ট জমিতে নানান মরশুমি শাকসবজি চাষ করার ইচ্ছে আছে।' সোমেনবাবু জানালেন, ঝুকাবাবুর জন্ম খুবই গরিব পরিবারে। টাকাপয়সার অভাবেই তিনি পড়াশোনা বেশিদূর করতে পারেননি। তাঁর ছেলেদের অবস্থাও তথৈবচ। স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ছাউনি তৈরি করার জন্য অর্থসংগ্রহ অভিযান শুরু করেছেন। স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা ৫ লক্ষ টাকা দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। সোমেনবাবু বলেন, 'টাকাটা পেলেই আমরা কাজ শুরু করব।' স্কুলের আর এক শিক্ষক সুব্রত শিট বলেন, 'আমরা স্কুলটিকে মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ঝুকা বাউরির দান সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের সাহায্য করবে।' ■

প্রাচীন ভারতের আইনি ব্যবস্থা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

অশোক কুমার চক্রবর্তী

আমাদের দেশে একটি ধারণা চালু আছে যে, ভারতবর্ষের আইনি ব্যবস্থা ইংরেজদের থেকে এসেছে এবং কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি ইংরেজদের করা। ১৮৮৫ সালের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' ও ১৯৩৫ সালের সংশোধিত আইন থেকে ভারতের সংবিধান রচনা করা হয়েছে।

বাস্তবিক কথা হলো, যে কোনও আইনই হঠাৎ সৃষ্টি হয় না বা আকাশ থেকে পড়ে না। আইনের যোগসূত্র সমাজের এবং সমাজতত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমেই প্রগতি পায়। এই প্রগতি সভ্যতার আদিম অবস্থা থেকেই। নীতি, ধর্ম, সাধারণ আইন সবসময়েই সমাজের প্রয়োজনে বিধিকরণ হয়।

আমাদের দেশে মহান ঋষিরা সভ্যতার আদিকাল থেকেই শাসন ব্যবস্থার জন্য শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই শাস্ত্র আবার অবতারদের কাছ থেকেও স্মৃতির মাধ্যমে এসেছিল, কারণ সমাজের একটা নৈতিক মাপকাঠি তৈরি করার জন্য এই শাস্ত্র প্রবর্তিত হয়েছেন। এই শাস্ত্রের আর একটি উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ। এই ঋষি বা অবতাররা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার বা কর্তব্যের ব্যাপারে দিকনির্ণয় করেছেন। চক্রবর্তী রাজা ভরত ও ভগবান রামচন্দ্রের সময় থেকে যে ন্যায় ব্যবস্থা চালু ছিল, তা হলো, নাগরিকগণ কর্তব্য সম্পাদন করবেন ও তার বিনিময়ে অধিকার পাবেন। এই কর্তব্য ছিল পিতা-মাতার প্রতি, সমাজের প্রতি, ন্যায়, নীতি ও আদর্শের প্রতি। জন্মসূত্রে মানুষের বাঁচার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং রাষ্ট্রের কাছে অধিকারও পাশাপাশি ছিল। অধিকার দান ও কর্তব্য সম্পাদন রাজা ও প্রজা উভয়ের তরফেই ছিল ধর্মের ভিত্তিতে। কারণ ভারতবর্ষের মহাঋষিরা এই কথা বারবার বলে গেছেন যে রাজা প্রজাদের অধিকারদানের সময়ে বিনীতভাবে ধর্মাচরণের মাধ্যমে রাজকার্য সম্পাদন করবেন। একইভাবে প্রজারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মাচরণের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। (মনুসংহিতা)

রাজা তাঁর বিচারসভায় নিজেকে ছাড়া গুরু, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, সাধারণ ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ এবং অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেই দণ্ড প্রয়োগ করতে পারবেন। ধর্মভিত্তিক সকলের সুখের জন্য এই যে ব্যবস্থা, তা বৈদিক সভ্যতা থেকেই এসেছিল।

বর্তমান ভারতের গণতন্ত্র বস্তুত পশ্চিমের দান নয়, বরং বৈদিক সভ্যতার ঋষিকুলের প্রবর্তিত বিধি থেকেই এসেছে।

আমাদের সংবিধানের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপিল্‌স্ অব স্টেট পলিসি, যা রাষ্ট্রের জন্য নির্দেশাত্মক নীতি, সেগুলিও প্রাচীন ভারতের নিয়মাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে। রাজধর্ম বলতে বোঝাতো যে রাজা একটি ধর্মীয় ও নৈতিক নীতির মাধ্যমে প্রজাদের কল্যাণ করবেন। সেই জন্যই আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বলা হয়েছে।

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্রের সময়ে যা কিছু শাসনকার্য, বিচারব্যবস্থা, তা প্রজাদের জন্যই এবং সেখান থেকেই উৎপত্তি গণতন্ত্রের। ভগবান রামচন্দ্র নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, কোনওরকম রাজশক্তির ক্ষমতা অপব্যবহারে যদি কোনও প্রজা কষ্ট পায়, তাহলে সেই রাজপুরুষকে কঠোরতম সাজা দেওয়া যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনও উদাহরণ নেই যে একজন রাজা ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক, সত্যবাদী, প্রজাবৎসল এবং তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন প্রজাদের হিতের জন্য।

মনু মহারাজ মনুসংহিতায় যে সব বিধির কথা বলেছেন, সেগুলো সাধারণভাবে অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা করে চলেছেন। আজকের খোরপোষ আইন, বিবাহের নিয়ম, দণ্ডনীতি, সবই মনু মহারাজের আইনি 'ফর্মূলা' থেকে নেওয়া। মনু মহারাজ বলেছিলেন যে জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থানই হবে দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচার্য। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ একই অবরাধে শূদ্র বা অন্যদের থেকে বেশি শাস্তি পাবেন। আমরা বর্তমানে আদালত অবমাননার মামলায় ও ফৌজদারি মামলায় দেখি যে বিচারকার্য হয় দুটি পর্যায়ে। এক অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা ও দুই, সাজা প্রয়োগ করা। এই দোষী সাব্যস্ত করার

পরে বিচারক সাজা প্রয়োগ করার সময়ে অপরাধীর জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থান বিচার করেন। আদালত অবমাননার মামলাতেও শাস্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থান অনুসারে কমবেশি হয়। বর্তমান আইনি ব্যবস্থা তাই মনু মহারাজের নীতি থেকেই এসেছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থানের কথাই দেখা যায়। বর্তমান আইন ব্যবস্থায় 'ইকুইটি' যাকে বলা হয় আইনি বিধির বাইরেও বিচার, সেটাও এসেছে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের প্রবর্তিত বিচার শাস্ত্র থেকেই। বৃহস্পতি তাঁর আইনি প্রবক্তায় বলেছেন যে কেবলমাত্র শাস্ত্রকে ব্যবহার করে বিচার করলে অনেক সময়ে বিচারের হানি ঘটে। সামাজিক অবস্থান বিচার করেই আইন প্রয়োগ করা উচিত।

এই নীতি ইংরেজ নাট্যকার আইনজীবী জন গলসওয়ার্দি তাঁর 'জাস্টিস' নাটকে গ্রহণ করে একটি প্রশ্ন তুলে গেছেন। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মারা গেলে মারা যাওয়ার কারণই বিচার্য ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় বৃহস্পতির নীতি গ্রহণ করে 'সেটির ভেয়িকল্‌স্ অ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং পরিবার বাঁচানোর জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শুক্রাচার্যের নীতি, যাজ্ঞাবল্ক্য, পরাশর ও ভৃগুর নীতি একইভাবে আইনের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছে। মজদুরদের ক্ষেত্রে কীভাবে তাদের মঙ্গল করা যায় তা শুক্রাচার্য তাঁর নীতিতে বলেছেন। এই নীতি গ্রহণ করেই শ্রমকল্যাণ সংক্রান্ত যা কিছু আইন বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রাচার্যের প্রবর্তিত বিধিগুলি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নেতারা প্রচার করেছেন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও তা গ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণের জন্য আইনি ব্যবস্থা রূপায়ণে। মানবিক অধিকার, 'ইকুইটি' যেগুলি একবিংশ শতাব্দীর দাবি, সেই নীতিগুলিও ঋষি নারদ, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, ঋষি ভৃগুর থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতের নীতিতে এই ব্যবস্থা ছিল যে যা কিছু অমানবিক, তাকে নীতিহীন, রাষ্ট্রবিরোধী বলে ভর্ৎসনা করা হবে। ফৌজদারি বিধিতে ইংরেজ প্রবর্তিত যে জুরি ব্যবস্থা ছিল, সেগুলি পুরোপুরি রাজা প্রবর্তিত ন্যায়ব্যবস্থা থেকেই নেওয়া। কেননা রাজাও ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও গুরু— এঁদের মতামত নিয়েই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

১৭২৬ সালের ইংরেজ প্রবর্তিত 'গ্রান্ট অব চার্টার'-এর মাধ্যমে মেয়রস্ কোর্ট স্থাপিত হয়। আচার্য চাণক্যের মিউনিসিপ্যাল নীতি থেকেই সেই 'মেয়াস্ কোর্টের সৃষ্টি হয়েছিল নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য। একইভাবে আমাদের বর্তমান সংবিধানের মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতা প্রাচীন ভারতের আইনি আদর্শ থেকেই নেওয়া। সংবিধান প্রবর্তিত ৫১-এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য কথাটিও ঋষিকুল প্রবর্তিত নীতি থেকে নেওয়া প্রজাদের মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব একই নীতির মধ্যে পড়ে। বৈদিক সভ্যতার আসল উদ্দেশ্য ছিল একটি ধর্মীয় বন্ধনযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা করা। আমাদের বিবাহ নীতিগুলিও একই ধর্মীয় বন্ধনযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার উপরেই করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত নাগরিকদের জন্য একই আইন, বিশেষকরে ১৪ অনুচ্ছেদ এই প্রাচীন ভারতের নীতি থেকেই নেওয়া। মনু মহারাজ প্রবর্তিত (মুনসংহিতা, শ্লোক ৭/১২৯) রাজার উপরে আইনি নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা দুর্বলতম শ্রেণী, অর্থাৎ শূদ্রদের থেকে কোনও কর নিতে পারবেন না। এই কথাটি মনু মহারাজ বলেছেন এবং মনুমহারাজ প্রবর্তিত দুর্বলতম শ্রেণীর জন্য আমাদের সংবিধানের ১৬(৪) ধারায় অনুচ্ছেদে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এসেছে।

দুঃখের কথা, ধর্ম শব্দটির অর্থ আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ঠিক বুঝতে পারেননি। যা কিছু কর্ম সমাজকে ধারণ করে, তাই ধর্ম। যা নষ্ট করে, তা অধর্ম। সেইজন্যই বিচারালয়কে ধর্মাধিকরণ বলা হয় এবং বিচারককে ধর্মাবতার বলা হয়। আর বিচারক যে দণ্ড প্রয়োগ কারণ তাকে ধর্মদণ্ড বলা হয়। ইংরেজরা একইভাবে বিচারককে 'মাই লর্ড' অর্থাৎ ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

আমাদের সংবিধানের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপিল্‌স্ অব স্টেট পলিসি, যা রাষ্ট্রের জন্য নির্দেশাত্মক নীতি, সেগুলিও প্রাচীন ভারতের নিয়মাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে। রাজধর্ম বলতে বোঝাতো যে রাজা একটি ধর্মীয় ও নৈতিক নীতির মাধ্যমে প্রজাদের কল্যাণ করবেন। সেই জন্যই আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বলা হয়েছে।

মনু মহারাজের আর একটি বিশেষ নীতি প্রবর্তিত হয়েছে (শ্লোক ৭/১২৯) যা মহাভারতের শান্তিপর্বে (অধ্যায় ৪৪, শ্লোক ৪-৭) দেখা যায়। পিতামহ ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রজাদের উপর কর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মৌমাছির মতন হতে বলেছেন। মৌমাছি যেমন ফল নষ্ট না করে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, ঠিক একইভাবে রাজাকেও নির্দেশ দেওয়া ছিল মৌমাছির মধু সংগ্রহ বা গাভীর বাঁট থেকে গোবৎসের দুধ খাওয়ার মতন রাজা কর নির্ধারণ করবেন। সংবিধানের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা ও আয়কর আইনের কর দুটি নীতিগুলিও উপরিউক্ত নীতি থেকেই এসেছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩০৫ এবং ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেগুলিই স্বীকৃতি লাভ করবে যেগুলি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয়। ইংরেজরা আমাদের এই নীতিগুলি গ্রহণ করেছে আইন গঠনের জন্য। আইনের যোগসূত্র ও পরম্পরা হলো প্রাচীন ভারতের আইনি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র শাসনকার্যের জন্য ইংরেজরা বাকি যে আইনগুলি প্রয়োগ করেছিল, সেগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক সেক্সপিয়ার, চার্লস্ ডিফেন্স, গলস্ওয়াদি প্রমুখ তাঁদের নাটক বা উপন্যাসে প্রবল সমালোচনা করেছেন (মার্চেন্ট অব ভেনিস্) অলিভার টুইস্ট্, জাস্টিস্ ইত্যাদি)। ভারতবর্ষের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একথা জোর করে বলার সময় এসেছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক নয়, বরং সমাজ রক্ষণে আইনের উৎস ও পথিকৃৎ। ■

বর্ষাকালের কৃষিকাজ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আমন ধান :

আমনধানের জন্য আষাঢ়ের মাঝামাঝির মধ্যে বীজতলা তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। এক বিঘাতে রোয়ার জন্য ২ কাঠা বীজতলা বানাতে হবে। নীরোগ, পুষ্ট, বাছাই বীজ হলে বীজতলার জন্য ৪ কোজি যথেষ্ট হলেও, সাধারণভাবে চাষিরা ১০ কোজ বীজ ব্যবহার করে ফেলেন। বীজতলাগুলির মাপ হতে পারে সাড়ে তিন ফুট চওড়া আর ৬৫ ফুট লম্বা : এরকম চারটি বীজতলা তৈরি করে প্রতিটিতে এক কেজি করে শোধন করা পুষ্ট বাছাই বীজ ফেলতে হবে। বীজতলা তৈরি করতে বীজ লাগানোর পূর্বে ২০ কেজি মতন জৈবসার, ৮ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ২ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করে জমি তৈরি করতে হবে। দেড় লিটার জলে এক কেজি বীজধান ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে তার সঙ্গে দুই গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে আরও ১০ ঘণ্টা রেখে, তারপর অঙ্কুর বার করার জন্য জাঁক দিতে হবে। দুদিন বাদে অঙ্কুর বের হলে বীজতলায় বীজ ছড়াতে হবে।

গোখাদ্য :

আষাঢ়মাসে তণ্ডুল জাতীয় ঘাস যেমন জোয়ার, ভুট্টা, দীননাথ ঘাস ও কোয়েক্স বীজ বোনা যাবে। জোয়ার লাগানো শুরু হতে পারে জ্যৈষ্ঠমাস থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি, ভুট্টা ফাল্গুনমাস থেকে আশ্বিনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, দীননাথ ঘাস জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথম পর্যন্ত, কোয়েক্স ঘাস জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণের প্রথম পর্যন্ত। এছাড়া বোনা যাবে শিম্বি গোত্রীয় বরবটি আর গাইমুগ। বরবটি বৈশাখের শেষ থেকে আষাঢ়ের প্রথমার্ধ এবং গাইমুগ জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বহুবর্ষজীবী তণ্ডুল জাতীয় ঘাস হাইব্রিড নেপিয়ার এবং প্যারা ঘাসের কাটিং লাগানো চলবে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথমার্ধ এবং বৈশাখের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথমার্ধ পর্যন্ত।

বর্ষাকালীন সবজি :

বর্ষাকালীন সবজি যেমন ঢ্যাঁড়স (আষাঢ়মাসে), ফরাসি বিন (আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি), লঙ্কা (আষাঢ়ের প্রথম, চৈত্রের শেষ থেকে শুরু), সিম, বরবটি, কচু, মিষ্টি আলু (আষাঢ়), মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, শশা (বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণের মাঝামাঝি) এবং লাউ (বৈশাখ থেকে আষাঢ়) লাগানোর অন্যতম প্রকৃষ্ট সময় আষাঢ়মাস।

পান :

আশ্বিন-কার্তিক ছাড়াও আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও পানের লতা লাগানো চলে। অর্থাৎ বর্ষার প্রথমে অথবা বর্ষার শেষে পান লাগাতে হয়। যেখানে বর্ষার প্রাবল্য বেশি এবং জল জমার প্রবণতা বেশি সেখানে চাষিরা বর্ষার শেষে আর যেখানে বৃষ্টি তুলনামূলকভাবে কম হয় সেখানে বর্ষার প্রারম্ভে পানের লতা বা বীচন লাগানোর চল আছে। আছে। খনার বচনে পাওয়া যায়, ‘‘পান পোতো শ্রাবণে/ খেয়ে না ফুরায় রাবণে’’।

পানের চারাগুলি বরজের মধ্যে ভাটিতে বা পিলিতে লাগাতে হবে, এগুলি আসলে বরজের ভেতরের মাটিতোলা উঁচু বা রিজ অংশ। দুটি ভাটি বা পিলির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার, সেখানে চারার দূরত্ব থাকবে ১৫ সেন্টিমিটার। প্রতি এক হাজার পানগাছের জন্য আড়াই শতক বা দেড়-কাঠা জমি লাগবে। আড়াই শতক বরজে ৪ থেকে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ২ থেকে ৩ কেজি ফসফেট এবং ২ থেকে ৩ কেজির মতো পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

আজকাল বাঁশ, পাটকাঠি, খড়ের বদলে শেডনেট দিয়ে পানের বরজ বানানো যায়। একাজে ৫০ শতাংশ (ফুটোর আকার ও ঘনত্ব অনুসারে বিভাজন) সবুজ রঙের শেড নেটই সবচাইতে উত্তম। ▮

সরকারি উদ্যোগে ত্রিপুরায় উদ্‌যাপিত শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৬ জুলাই ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত হলো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজক ত্রিপুরা সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর। সরকারি উদ্যোগে এই প্রথম ত্রিপুরায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হলো। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মূল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলেও, জেলাগুলিতেও সরকারি উদ্যোগে পালিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী। রবীন্দ্রভবনে শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জগদীশ গণচৌধুরী। সভায় মুখ্য বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অতুল দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তাঁর ভাষণে বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের ভিতর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে গিয়েছেন। তিনিই আমাদের অনুপ্রেরণা এবং পথপ্রদর্শক। এই জাতীয়তাবোধ না থাকলে দেশকে ভালোবাসা যায় না, দেশের কাজ করা যায় না, দেশের উন্নতি করাও সম্ভব নয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক সরকার। এই সরকার যা করে তা দেশের হিতে। নিছক রাজনীতি করার জন্য এই সরকার কোনও কাজ করে। এর আগের সরকারের ভিতর এই জাতীয়তাবোধেরই অভাব ছিল। ত্রিপুরা সরকারও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই কাজ করে যাবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সভার মুখ্য বক্তা রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ভারত বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শেখ আবদুল্লা যখন কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির বীজ রোপণ করছেন, তখন শ্যামাপ্রসাদই আওয়াজ তুলেছিলেন এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান। সেদিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। করলে আজ কাশ্মীরে এভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিতে পারত না। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও জানান রন্তিদেববাবু।

সভার সভাপতি জগদীশ গণচৌধুরী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ নিছক রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্রনায়কের মতোই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে দেশকে স্থান দিয়েছিলেন তিনি। জগদীশবাবু ত্রিপুরার উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতার পরপরই মুসলমান নেতারা ত্রিপুরার কিশোর রাজা এবং রাজমাতাকে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরা দখল করতে চেয়েছিল। ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঞ্চলেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। মহারানি তাঁর কিশোর পুত্রকে নিয়ে শিলংয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপে রক্ষা পায় ত্রিপুরা।

সভার অন্য বক্তা বিধায়ক অতুল দেববর্মা বলেন, বাঙালি হিন্দু চিরকাল শ্যামাপ্রসাদকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে মনে রাখবে। শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের গ্রাসে যেত। হিন্দু বাঙালির জীবন বিপন্ন হতো। এই অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্রও দেখানো হয়।

গত ৭ এবং ৮ জুলাই পরপর দুদিন 'ফিরে দেখা' নামক একটি সংস্থার পক্ষ থেকে উদয়পুর এবং আগরতলায় দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দুটি আলোচনা সভারই বিষয়বস্তু ছিল 'শ্যামাপ্রসাদ এবং বঙ্গ বিভাগ।' আগরতলার আলোচনা সভার প্রস্তাবক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ মাহাতো বলেন, দেশভাগ পর্বে যে নৃশংসতার শিকার হয়েছে হিন্দু বাঙালি তা কখনো ভোলা যাবে না। হিন্দু বাঙালির ওপর সেই আক্রমণ এখনও বাংলাদেশে চলছে। দুটি আলোচনা সভারই মূল বক্তা রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, বাঙালি পরিচয় দিয়ে দুই বাংলার অধিবাসীদের এক করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু শুধু বাংলা বললেই জাতিসত্ত্বায় বাঙালি হওয়া যায় না। পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারী যে বাঙালি, জাতিসত্তায় তিনিই প্রকৃত বাঙালি। অর্থাৎ হিন্দু বাঙালিরাই জাতিসত্ত্বায় বাঙালি। বাঙালি আর বাংলাদেশিদের ভিতর এই পার্থক্যটা করতে হবে। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের পশ্চিমবাংলা যে আজ মুসলমান তোষণের বাংলা হয়ে উঠেছে— বিভিন্ন উদাহরণের ভিতর দিয়ে তাও উল্লেখ করেন বক্তা।

পুলিশকে অন্ধকারে রেখে হার্দিকদের জনতা রেইড

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিধায়ক হলেই নাকি আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া যায়। গুজরাট পুলিশের অভিযোগ তাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কংগ্রেস বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুর, পতিদার নেতা হার্দিক প্যাটেল এবং নির্দল বিধায়ক জিগনেশ মেওয়ানি সম্প্রতি গান্ধীনগরের আদিওয়াদা গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চনবা মাকওয়ানার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান করেছেন। কাঞ্চনবার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ, তিনি দেশি মদ তৈরির ব্যবসায় লিপ্ত। ঘটনাস্থল থেকে দেশি মদের দুটি পাউচও তারা উদ্ধার করেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু যে কাজ পুলিশের করার কথা সেই কাজ বিধায়করা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করতে পারেন কিনা আপাতত সেই বিতর্কে উত্তাল দেশের রাজনৈতিক মহল।

৫৫ বছর বয়েসি কাঞ্চনবা মাকওয়ানা পুলিশের কাছে তিন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে তিনি বিধবা এবং চার সন্তানের জননী। তাঁর অভিযোগ, ১৫-২০ জন অনুগামী-সহ তিন নেতা নিজেরাই দেশি মদের পাউচ নিয়ে তাঁর বাড়িতে তল্লাশির নাটক করেছিলেন স্রেফ তাঁকে ফাঁসানোর জন্য। পুলিশ ৪৫২, ৫০৪, ১৯৩, ১১৪ ধারায় তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৫ জুলাই অল্পেশ, হার্দিক এবং জিগনেশ দলবল নিয়ে কাঞ্চনবার বাড়িতে চড়াও হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল জনতা রেইড। কাঞ্চনবার বাড়িতে যে দেশি মদ তৈরি এবং বিক্রি হয় এ ব্যাপারে তাদের কাছে নাকি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছিল। তিন নেতা পরে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন, যাতে দেশি মদের পাউচ দুটি ছিল।

অল্পেশ ঠাকুর, জিগনেশ মেওয়ানি এবং হার্দিক প্যাটেলকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করে গান্ধীনগরের এসপি বীরেন্দ্র যাদব বলেন, ‘এরকম করার কোনও অধিকার ওদের নেই। কাল যদি কেউ ওদের বাড়িতে চড়াও হয় তখন ওরা কী

করবেন?’ পুলিশ সুপার আরও জানান, একথা ঠিক কাঞ্চনবার বিরুদ্ধে এর আগেও বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পুলিশ শুধুমাত্র উড়ো অভিযোগের ভিত্তিতে কারও বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পারে না। অন্যদিকে অল্পেশ ঠাকুর বলেন, ‘বিধায়করা চাইলে এরকম জনতা রেইড করতে পারেন। তাছাড়া আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকিনি। আমাদের মধ্যে একজন ক্রেতা সেজে মদ কিনতে গিয়েছিল। পাউচ দুটো হাতে পাওয়ার পর আমরা পুলিশকে জানাই।’ যদিও গান্ধীনগরের এসপি জানিয়েছেন, তারা পৌঁছবার আগেই নেতারা বাড়িতে ঢুকেছিলেন। মিডিয়াও পৌঁছে গিয়েছিল। গুজরাটের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ জাদেজা তিন নেতাকে ‘প্রচারের জন্য কাঙাল’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ‘রাজ্য সরকার যে কোনও ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওরা যা করেছেন সেটাও বেআইনি।’ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। সন্দেহজনক কিছু পেলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

দু’দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ ভারতের প্রশংসা করল নেপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত ও নেপালের মানুষের আত্মিক বন্ধন আরও মজবুত করে তোলার জন্য ভারত সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রশংসা করল নেপাল। বিশেষ করে দু’দেশের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য যেসব প্রকল্পের কাজ চলছে তার প্রশংসা বেশি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জয়নগর থেকে জনকপুর-কুরথা এবং যোগবানি থেকে বিরাটনগর পর্যন্ত রেলনাইন পাতার কাজ জোর কদমে চলছে। চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার ব্যাপারে দুই দেশই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কুরথা থেকে বিজলপুরা-বারদিবাস এবং বিরাটনগর কাসটমস ইয়ার্ড থেকে বিরাটনগর শহরের মধ্যে প্রস্তাবিত রেলপথ তৈরির কাজও দ্রুত শেষ করতে চায় দুটি দেশ। প্রোজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রকসৌল এবং কাঠমাণ্ডুর মধ্যে রেলপথ তৈরি করার ব্যাপারেও কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। স্থির হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব প্রযুক্তিগত এবং ট্রাফিক সংক্রান্ত পর্যালোচনা শেষ করে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।

উত্তর-পূর্বে নিরাপত্তার বিপুল উন্নতি হয়েছে : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার আমূল উন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। গত ১০ জুলাই শিলংয়ের রাজ্য কনভেনশন সেন্টারে উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের সাতষট্টিতম বার্ষিক অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে দেখেছেন। অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশ ও মেঘালয় থেকে আফস্পা (আমর্ড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে রাজনাথ জানান বহির্নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকেও আরও জোরদার করার ব্যাপারে কেন্দ্র সচেতন রয়েছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের মধ্যে ছ'টিতে বিজেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকার রয়েছে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থার মতো বিষয়গুলি কড়া হাতে মোকাবিলার প্রশাসনিক সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, 'শান্তি ও সাধারণ জীবনযাত্রা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যক্তিগত শিল্প বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব ছিল না। এন ডি এ সরকারের আমলে উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে এখানে শান্তি ফিরে আসা।' তথ্য পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, নব্বইয়ের দশকের সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমান সময়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কমেছে। সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তা কর্মীদের মৃত্যুর হার এই তুলনামূলক পরিসংখ্যানে ৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, ত্রিপুরা ও মিজোরামে বর্তমানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ একেবারে শূন্য। রাজ্যগুলিও উন্নতি করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার উন্নতি হলে সুরক্ষিত থাকবে গোটা দেশই।

চীনের হঠকারিতায় বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুখে যতই বড় কথা বলুক না কেন, চীন যে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয় তা ফের বুঝিয়ে দিল চীনা-প্রশাসন। গত ৯ জুলাই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরিবেশ- গোষ্ঠী এনভায়রনমেন্টাল এজেন্সি (ই আই এ) দাবি করেছে দশটি চীনা প্রদেশের ১৮টি বড়ো কারখানা ওজোন নিঃশেষক ক্লোরোফ্লুরো কার্বন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এর যে কোনও রকম প্রয়োগ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে শিল্প রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে ক্লোরোফ্লুরো কার্বনকে তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংগঠনটির বক্তব্য, এই চীনা কোম্পানিগুলির অধিকাংশ মোম প্রস্তুত করে। বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে শিল্পদ্রব্য মোমের চাহিদা রয়েছে চীনে। এই মোম তৈরিতে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন-১১ ব্যবহৃত হচ্ছে সস্তা ও সহজলভ্য বলে। এই বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যটি ওজোন স্তরকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সূর্যের রশ্মি অপ্রতিহতভাবে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকছেই। ১৯৮৭ সালে মনট্রিয়েল প্রটোকল অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে এই ক্লোরোফ্লুরো কার্বন নিষিদ্ধ করা হয়। ২০১০ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলি এই দ্রব্য গ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরোধ নতুন নয়। কিন্তু ভারত দায়বদ্ধতা দেখালেও চীন তা না দেখানোয় বিষয়টি নিয়ে উন্নত দেশগুলির প্রশ্নের মুখে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে কূটনৈতিক মহলের অভিমত।

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১৭

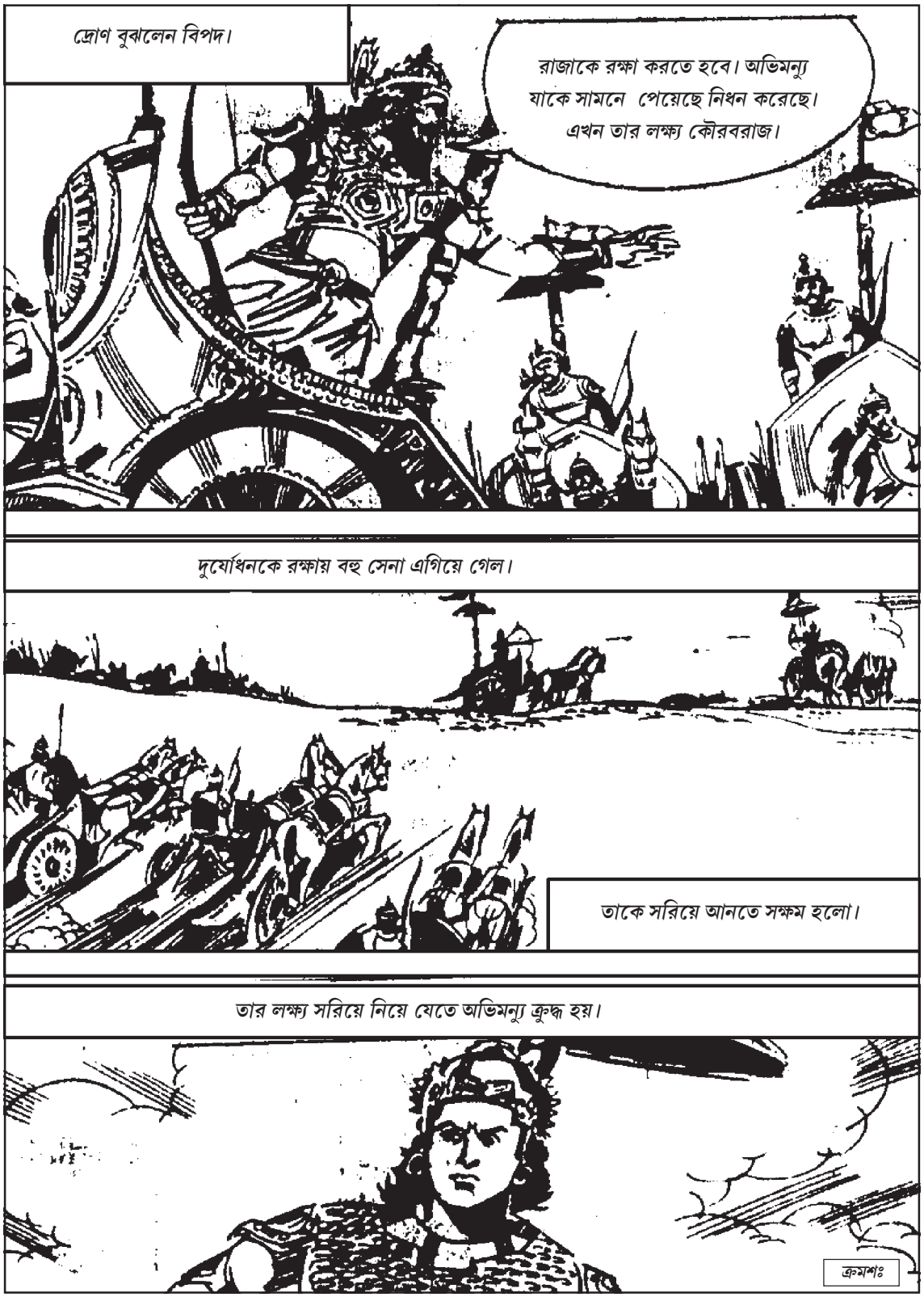

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

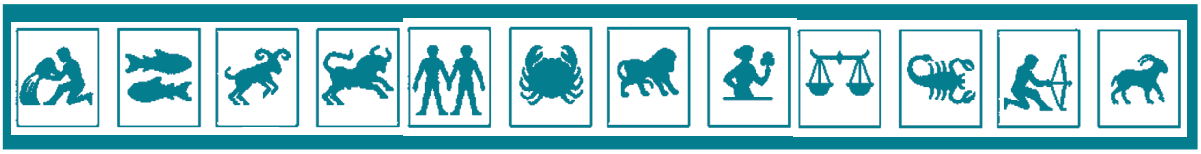

১৬ জুলাই (সোমবার) থেকে ২২ জুলাই (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি, কর্কটে বুধ-রাহু। সিংহে শুক্র, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে বক্রী মঙ্গল-কেতু। সোমবার রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে রবির কর্কটে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে পুষ্যা থেকে বৃশ্চিকে বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ : সংগীত সাহিত্য, অভিনয় কুশলতায় যশ-খ্যাতি ও সম্মান। শারীরিক ও গৃহ-সংক্রান্ত আইন জটিলতায় মানসিক অস্থিরতা ও ব্যয়বাহুল্যের চাপ। সন্তান-সন্ততির জ্ঞানার্জনের বহুমুখী প্রয়াস।

বৃষ : গৃহ পরিবেশে আনন্দধারা বহমানতার শুভ যোগ। স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অথবা উচ্চশিক্ষায় কীর্তিমানের পরিচয়। পরোপকারের বিরামহীন প্রয়াসে সুহৃদের সৌহার্দ্র্যপূর্ণ ব্যবহার। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

মিথুন : সপ্তাহের প্রথমার্ধে মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ ঘরছাড়া বেদুইনভাব, জীবনের চেনাছন্দে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সময়ের অপচয়, লাইফ পার্টনারের ইতিবাচক ভূমিকায় হতাশার মহাসমুদ্রে নব-সূর্যোদয়।

কর্কট : গুণীজন অথবা সদাচারীর সান্নিধ্যলাভে হর্ষোৎফুল্লিত চিত্ত। শিল্পী ও সৌন্দর্য পিপাসুদের কর্মের বহুমুখী প্রসার, সমাজসেবায় দান-ধ্যান ও তীর্থভ্রমণ, অনিয়মের কারণে অসুস্থতা ও বেকারদের কর্মসংস্থানের শুভ যোগ।

সিংহ : বিদ্যার্থী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। ভবিষ্যৎ বিষয়ে সন্তানের নিজ উদ্যোগ ফলপ্রসু হবে। অংশীদারী ব্যবসায় লগ্নির ক্ষেত্রে অনুকুল সময়, বিরোধীদের অতি সক্রিয়তায় টেনশান ও রক্তচাপ বৃদ্ধি।

কন্যা : সরলতা, সততা, সদ্ব্যবহার, শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণ, স্বজন বাৎসল্য, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় সুধাময় দৃষ্টি ও যোগ্যভূমিকায় স্বচ্ছন্দ পদচারণা, ব্যবসার নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। পত্নীর সূত্রে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার।

তুলা : ভ্রাতা ও প্রতিবেশীর কর্মের যোগসূত্রে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ও প্রবাস। পরস্পরের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও বিলাসবহুল সুখী জীবন। প্রেমের দগ্ধ হৃদয়ে শীতল বারিবর্ষণ। বন্ধুর দ্বারা বিশেষ কোনও সুযোগ প্রাপ্তি। চাকুরিজীবীদের ভিন্ন স্বাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও মানসিক চাপ। উচ্চাভিলাষের প্রলোভনে শান্ত ও সংযমী হওয়া প্রয়োজন। সন্তানের জ্ঞানান্বেষণে গুণীজনের সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানলাভ। মিত্রস্থান হিতকারী নয়। শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও কীটপতঙ্গ থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : গুরুজন ও দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সমাজসেবায় হৃদয়বান ব্যক্তিদের আত্মচিন্তাশূন্য সহযোগিতা। প্রকাশক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঔষধি ও বস্ত্র ব্যবসায়ীর অর্থাগমের অনায়াস সাফল্য। সন্তানের চাল-চলনে আধুনিকতার পরশ।

মকর : গৃহের পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পবিত্র মন কলুষিত হবে। মাতুলের সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি হলেও অকারণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, রমণীর নিকট সান্নিধ্য ও সৌভাগ্যের নতুন দিশা।

কুম্ভ : বিদ্যার্থী, বিজ্ঞানী, গবেষক, শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশ ও মান্যতা প্রাপ্তি। দূর ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তন। বাগ্মিতায় বুদ্ধিজীবীদের শংসা লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে চোখ, হাড়, দাঁত ও পেটের গণ্ডগোলে ভোগার সম্ভাবনা। অর্থাগমের একাধিক পন্থার উন্মেষ।

মীন : সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সাত্ত্বিক ও মননশীল দৃষ্টিতে সর্বাধিক সময় ব্যাপৃত থাকবে। গুণীজন-পণ্ডিতমহল ও সাহিত্যিক সমাজে নিজ প্রতিভা সমাদৃত হবে। সন্তানের পড়াশুনায় মনঃসংযোগের অভাব।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য